অয়োময়

হুমায়ূন আহমেদ

অনুপম প্রকাশনী

অয়োময়

বদরুল আলম সাহেব তারাবীর নামাজ পড়তে যাবেন — কি মনে করে যেন বাংলা ঘরে উঁকি দিলেন। ঘর অন্ধকার। অথচ তিনি সন্ধ্যাবেলায় মাগরেবের নামাজে দাঁড়াবার আগেই বলেছিলেন বাংলা ঘরে যেন বাতি দেয়া হয়। এরা কেউ কথা শোনে না। রাগে তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। ইদানীং তাঁর এই সমস্যা হয়েছে, রেগে গেলে শরীর কাঁপে।

বাংলা ঘরে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। বিকট দুর্গন্ধ। মানুষের শরীর পচে গেলে এমন ভয়াবহ ব্যাপার হয় কে জানত। দুর্গন্ধ নাকের ভিতর দিয়ে ঘ্যাৎ করে মাথায় চলে যায়। মাথা ঝিম ঝিম করে। তারপরই বমি বমি ভাব হয়। বদরুল আলম সাহেব রুমাল দিয়ে নাক ঢাকলেন। ঘরে ঢোকার আগেই ঢাকা উচিত ছিল। দেরী হয়ে গেছে। তাঁর মেজাজ আরো খারাপ হল। বাংলা ঘরে ঢোকা উচিত হয়নি। কিছুক্ষণ আগে ভাত খেয়েছেন, খাবার দাবার বমি হয়ে যেতে পারে। তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন এখন ভাত না দিতে। তারাবী পড়ে খাবেন। এটা শুনল না। কেউ আজকাল তার কথা শুনছে না।

তিনি নাকে রুমাল চাপা দিয়েই ডাকলেন– এ্যাই, এ্যাই।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মরে গেছে না-কি? আশ্চর্য, একটা মানুষ অর্ধেকটা শরীর পচে গেছে তবু মরার নাম নেই। উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে। বলেছে, হাসপাতালে রেখে কি করবেন। বড় জোর দুই দিন, বাড়িতে নিয়ে যান। বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের মাঝখানে আরাম করে মরবে।

আর গাধাগুলি তাকে নিয়ে এসে তাঁর বাংলা ঘরে শুইয়ে দিয়েছে। কী যন্ত্রণা। এটা কি তার বাড়ি ঘর? গাধাগুলির সাহস দেখে তিনি স্তম্ভিত। বাংলা ঘর দশ কাজে ব্যবহার হয়। লোকজন আসে। সেখানে আধা পচা মানুষ এনে শুইয়ে দিল। বিকট গন্ধে বাংলা ঘরের ত্রিসীমানায় এখন কেউ যেতে পারে না। নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসে।

তিনি আরো উঁচু গলায় ডাকলেন— এ্যাই, এ্যাই।

কোন জবাব পাওয়া গেল না। তিনি কিছুক্ষণ কান পেতে রইলেন। নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও আসছে না। নড়াচড়ার শব্দও নেই। মারা গেছে বোধ হয়। আশ্চর্য এই বাড়ির লোকজনের কাণ্ডজ্ঞান। এখন মরে তখন মরে একটা মানুষ, তার ঘরে সন্ধ্যাবেলা বাতি দেয় নি। অথচ তিনি নিজে জায়নামাজে দাঁড়াবার আগে বলেছেন যেন বাতি দেয়া হয়। কতক্ষণ আগে মরেছে কে জানে। অন্ধকার ঘর, কে জানে শিয়াল কুকুরে টেনে নিয়ে গিয়ে হয়তো খেয়ে ফেলেছে।

তিনি নাক থেকে রুমাল সরাতেই ভক করে আরও খানিকটা গন্ধ ঢুকে গেল। তিনি বিশেষ গ্রাহ্য করলেন না। দেয়াশলাইয়ের কাঠি ধরালেন। ঘর খানিকটা আলো হল।

না মরে নি। পিট পিট করে তাকাচ্ছে। ডাক্তার বলে দিয়েছে দ'ুদিনের বেশী টিকবে না। আজ হল তের দিন। আজকাল ডাক্তারগুলির কি রকম বিদ্যা-বুদ্ধি। যে রুগীর দু'দিন বাঁচার কথা সে তের দিন বাঁচে কি করে?

বদরুল আলম সাহেব বললেন, বেঁচে আছো? ইউনুস বলল, জ্বে আছি।

যখন এ্যাই বললাম, তখন কথা বললে না কেন?

ইউনুস জবাব দিল না। সে কথা বলেনি ভয়ে। বদরুল আলম সাহেবকে সে বড় ভয় পায়। তাছাড়া সে এই বাড়ির কামলাও না। সে কাজ করত পুব-পাড়ায়। তারা তাকে রাখতে রাজি না হওয়ায় সবাই মিলে এই বাড়িতে রেখে গেছে। বদরুল আলম সাহেবও রাখতে রাজি হননি। দু'দিনের বেশী টিকবে না শুনে কিছু বলেন নি। তাছাড়া রমজান মাস।

বদরুল আলম সাহেব রাগী গলায় বললেন, ঘরে বাতি দেয় নাই?

দিছিল, নিভ্যা গেছে।

কুপীর বাতি। বাতাসে নিভে যাওয়ারই কথা। বাংলা ঘরে এখন কেউ আসে না, কাজেই হারিকেন দেয়া বিপদজনক। চোর এসে নিয়ে যাবে। এই লোক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে, কিছু করতে পারবে না।

ভাত দিয়েছে?

জ্বে দিছে।

আচ্ছা ঠিক আছে।

ঘর থেকে বেরুবার আগে তিনি আবার কুপী জ্বেলে দিয়ে গেলেন। যতক্ষণ থাকে থাকুক।

মসজিদে সবাই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। তিনি যাওয়া মাত্র তারাবীর নামাজ শুরু হল। নামাজ শেষ হতে তেমন সময় লাগল না কিন্তু দোয়া আর যেন শেষ হতেই চায় না। এক দোয়ায় বাংলা, উর্দু,আরবী, নানান ভাষা। এই মৌলানা সাহেবের চাকরি এখনো স্থায়ী হয়নি। রমজানে মাসে তাঁর কাজকর্ম দেখে তারপর স্থায়ী করা হবে তেমন কথা হয়েছে।

ব্যাটা সে কারণেই দোয়ার মাধ্যমে কাজ কর্ম দেখাচ্ছে। দোয়ার শেষ পর্যায়ে আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। বড়ই বিরক্তিকর।

বদরুল আলম সাহেব ঠিক করে রাখলেন আজ মৌলানাকে দু'একটা কথা বলবেন। তিনি মসজিদ কমিটির সভাপতি। তাঁর পক্ষে এইসব বলা ভাল দেখায় না, তবু বলতে হবে। মানুষের কাজ কর্ম আছে। সারারাত জেগে দোয়া পড়লে তো হবে না। মৌলানা সাহেব দোয়ার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন -ওগো পেয়ারা নবীর পেয়ার দোস্ত, তোমার কাছে হাত না তুললে আমরা কার কাছে হাত তুলব? কারণ তুমি নিজেই তো কোরান মজিদে বলেছ-

'মারাজ্বাল বাহরাইনি ইয়ালতাক্বিইয়া-ন'

অর্থাৎ— তিনি বহমান রেখেছেন দু'টি বিশাল জলরাশিকে ...

বাইনহুমা-বারযাখু

অর্থাৎ —তাদের দু'য়ের মাঝে রয়েছে কুদরতী পর্দা ...

বদরুল আলম সাহেবের বিরক্তির সীমা রইল না।

আজ রাতের দোয়া মনে হচ্ছে শেষ হবে না। মৌলানাকে সাবধান করে দিতে হবে। কিছু না বলায় লাই পেয়ে যাচ্ছে।

দোয়া শেষ হল। বদরুল আলম সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, মৌলানা সাহেব আপনার সংগে একটা কথা ছিল। তাঁর গলার স্বরেই মৌলানা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তিনি কি বলবেন তা না শুনেই বলল, আপনের কথা মত আমি গেছিলাম। সে রাজি হয় না। এই কাজ তো জবরদস্তিতে হয় না। যদি বলেন আইজ না হয় আরেকবার যাব।

আপনে কিসের কথা বলতেছেন?

আপনে যে বলছিলেন তওবা করাইতে। তওবা করতে রাজি হয় না।

এতক্ষণ বদরুল আলম সাহেবের মনে পড়ল। মৌলনাকে গত সপ্তাহে বলেছিলেন যেন ইউনুসকে দিয়ে তওবা করানো হয়। একবার তওবা করে ফেললে

তিনদিনের ভেতর ঘটনা ঘটে যায়। তাঁর ধারনা ছিল, মৌলানা তওবা করিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে তওবা করায়নি।

তওবা করতে চায় না কেন?

ভয় পায়। মরতে চায় না।

তওবার সাথে বাঁচা-মরার কী সম্পর্ক? জন্মমৃত্যুতো আল্লাহর হাতে। আপনি এখনি চলেন। তওবা করিয়ে দেন। আমি সামনে থাকলে অরাজি হবে না।

জ্বি আচ্ছা।

তাছাড়া এখন মৃত্যু হলেতা তার জন্যে শুভ । রমজান মাসে মৃত্যু সরাসরি জান্নাতের দরজা – কি বলেন আপনারা।

সবাই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। একজন বলল, এর জন্য আপনি যা করছেন তা বাপ-মাও করত না। বাপ মা'র অধিক করছেন আপনি।

বদরুল আলম সাহেব উদাস গলায় বললেন, আমি তো করার কেউ না। যার করার তিনিই করেন। আমরা হলাম উপলক্ষ। ঐ দিন মিয়া বাড়ির কুদ্দুস সাহেব আসছিলেন। তিনি বললেন, আপনি করছেন কি? অরে অন্য কোনখানে ফালায়ে দিয়ে আসেন। আমি বললাম, রমজান মাসে এই রকম কথা মুখে আনবেন না কুদ্দুস সাহেব।

ইউনুসকে এক ধমক দিতেই সে তওবা করতে রাজি হয়ে গেল। মৌলানা সাহেব বললেন, এইবার আল্লাহপাক তোমাকে আজাব থেকে মুক্তি দিবেন। তাছাড়া তুমি এখন সাত দিনের শিশুর মত পবিত্র। সরাসরি জান্নাতে দাখিল হবে। বুঝতে পারলা?

জ্বে পারছি।

কারো উপরে কোন দাবি দাওয়া রাখবো না। দাবী দাওয়া তুইল্যা নাও।

জ্বে-আচ্ছা।

বললে তো হবে না। বল কারো উপরে কোন দাবী দাওয়া নাই।

কারো উপরে কোন দাবী-দাওয়া নাই।

মৌলানা সাহেব থাকেন মসজিদে। মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে মসজিদের পাশেই একটা ঘর তুলে দেয়ার কথা। এখনো তোলা হয়নি। সবই অবশ্যই নির্ভর করছে বদরুল আলম সাহেবের উপর। তিনি একবার হ্যাঁ বললেই হয়। মৌলানা সাহেব মসজিদে যাবার আগে বদরুল আলম সাহেবের সংগে দেখা করে গেলেন। বদরুল আলম সাহেব বললেন, তওবা ঠিক ঠাক হয়েছে?

জ্বি।

অবস্থা কি দেখলেন?

সময় ঘনায়ে আসছে। তওবার পরে তিন দিনের বেশী টিকে না। তবে এ তাও ঠিকবে না।

হয়েছে কি?

জানি না। শরীর পচে যাচ্ছে এইত দেখি। গন্ধে থাকা মুশকিল।

এদিকে সাতাশ রোজায় মেয়ে, মেয়ে-জামাই আসতেছে।

মৌলানা দৃঢ় স্বরে বলল, এ এক দুই দিনের বেশী নাই।

তওবা পড়ানোর চতুর্থ দিনেও দেখা গেল ইউনুস বেঁচে গেছে। প্রশ্ন করলে চিঁ-চিঁ করে জবাব দেয়। তবে অবস্থা যে খুব খারাপ তা বোঝা যায়। আগে শরীরের পচা দুর্গন্ধ বাংলা ঘরের আশে পাশেই সীমাবদ্ধ ছিল এখন তা ভেতর বাড়ি পর্যন্ত গেছে।

সেনিটারী ইন্সপেক্টরের পরামর্শে ঘরের চারদিকে প্রচুর ফিনাইল দিয়েছেন, তাতেও গন্ধ যাচ্ছে না। তাছাড়া বাংলা ঘরের চারপাশে এখন শিয়াল ঘুরাফিরা করে। মানুষ-পচা গন্ধের আর্কষণ এড়াতে পারে না।

বদরুল আলম সাহেব নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দেখতে গেলেন, কি রে অবস্থা কি?

জ্বে ভাল।

ভাল হলেই ভাল।

রাইতে বড় ভয় লাগে।

ভয় লাগে কেন?

কি যেন চাইরপাশে ঘুরাফিরা করে। চউক্ষে দেখি না, খালি কথা শুনি।

মৌলানা সাহেব এসব শুনে বললেন, সময় ঘনায়ে আসছে। আজরাইল চাইরপাশে ঘুরাফিরা করে।

মৌলানার উপর বিরক্তিতে বদরুল আলম সাহেবের গা জ্বলে যায়। কি সব কথা, আজরাইল ঘুরাফিরা করে। ব্যাটা তওবাটা ঠিকমত পড়িয়েছে কি-না কে জানে।

মৌলানা সাহেব?

জ্বি।

তওবা কি টিকঠাক পরানো হয়েছে?

জ্বি তা হইছে।

দেখেন আরেকবার পড়াবেন কি-না। কষ্ট পাচ্ছে এই জন্যে বলতেছি, অন্য কিছু না।

আইজ আরেকবার পড়ায়ে দিব। কোন অসুবিধা নাই। তওবা দিনের মধ্যে দুইবারও পড়ানো যায়। কোন অসুবিধা নাই। এই প্রসংগে রসুলাল্লাহর একটা হাদিস আছে। পেয়ারা নবী বলেছেন...

আচ্ছা থাক। আরেকদিন শুনব।

মৌলানা সাহেব বললেন, অনেক সময় মনের মধ্যে কোন আফসোস থাকলে জ'ব বাইর হইতে চায় না। জিজ্ঞেস কইরা দেখা দরকার কিছু খাইতে চায় কি না। কাউরে দেখতে চায় কি-না।

আচ্ছা এটা খোঁজ নিব।

দ্বিতীয়বার তওবার কথা শুনে ইউনুস বেশ অবাক হল। চি-চি করে বলল, একবার তো করছি। তওবার পরে কোন পাপ কাজ করি নাই।

মৌলানা সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, নাফরমানী কথা বলবা না। পাপ কাজ করছ কি কর নাই তার বিচার তোমার উপরে না, আল্লাহ পাকের উপরে।

আবার তওবা পড়ানো হল। বদরুল আলম সাহেব তওবা পড়ানোর শেষে খোঁজ নিতে এলেন, কি-রে শইল কেমন?

জ্বে ভাল।

কিছু খাইতে মনে চায়?

জ্বে না।

মনে চাইলে বল।

তেঁতুলের পানি দিয়া ভাত খাইতে মনে চায়।

তাকে তেঁতুলের পানি দিয়ে ভাত খেতে দেয়া হল। ভাত খাওয়া শেষ হবার সংগে সংগেই শ্বাসকষ্ট শুরু হল। বুক হাঁপরের মত উঠা-নামা করছে। চোখ মনে হয় বের হয়ে আসছে। বদরুল আলম সাহেব মৌলানাকে খবর দিয়ে রাখলেন। ভালমন্দ কিছু হলে দিনের মাধ্যেই দাফন কাফন শেষ করতে হবে।

দিনে কিছুই হল না। রাতে শ্বাসকষ্ট মনে হল খানিকটা কমে এসেছে।

মৌলানা সাহেব ঘুমুতে গেলেন। যাবার আগে বদরুল আলম সাহেবকে বলে গেলেন, আরো একটা দিন দেখতে হবে।

বদরুল আলম সাহেব শুকনো গলায় বললেন, আর একদিন পরে কি?

অমাবশ্যা লাগতেছে। অমাবশ্যার টান সহ্য হবে না।

বদরুল আলম সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, একদিকে বলেন আজরাইলের কথা, আরেকদিকে বলেন অমাবশ্যার কথা। আজরাইল কি পূর্ণিমা অমাবশ্যা দেখে ঘুরাফিরা করে?

অমাবশ্যার রাতে ইউনুসের অবস্থা খুবই খারাপ হল। বুকের ভেতর থেকে গোঁ গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে। মুখে ফেনা ভাঙছে। রাত যে কাটবে না, তা বোঝাই যাচ্ছে। বদরুল আলম সাহেবের স্ত্রীও শাড়ির আঁচলে মুখ চেপে এক সময় ইউনুসকে দেখে গেলেন। খাবার প্লেটে পড়ে আছে। ইউনুস ছুঁয়েও দেখেনি। তিনি বললেন, এর মুখে তোমরা পানি দাও, দেখছ না ঠোঁট চাটতেছে। আহারে।

ভোরবেলা বদরুল আলম সাহেব খোঁজ নিতে গেলেন।

কী রে অবস্থা কী?

ইউনুস চিঁ চিঁ করে বলল, জে ভাল।

শ্বাসকষ্ট নাই?

জ্বে না।

বদরুল আলম সাহেবের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ইউনুস বলল, রাইতে একটা শিয়াল ঢুকছিল। পাও হাতে কামড় দিছে। আইজ আপনে বইল্যা দিবেন হাতের কাছে যেন একটা লাঠি দেয়। আর একটা হারিকেন।

বদরুল আলম সাহেব কিছুই বললেন না। তাঁর মেজাজ রোজার সময় এমনিতেই চড়া থাকে। আজ সেই মেজাজ আকাশে চড়ে গেল।

তিনি ইফতারির সময় মজনুকে বলে দিলেন, ইউনুসের হাতের কাছে যেন একটা লাঠি দেয়া হয়। আর একটি হারিকেন। মজনু এ বাড়ির কামলা। তার উপর দায়িত্ব ইউনুসকে খাবার দাবার দিয়ে আসা। এই কাজটা তার খুবই না-পছন্দ, কারণ ইউনুস এখন আর নিজে নিজে খেতে পারে না। খাবার মুখে তুলে দিতে হয়। ঘেন্নায় মজনুর বমি আসার উপক্রম হয়।

মজনু বলল, ইউনুস হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।

বদরুল আলম সাহেব তাকালেন। কেন বজ্জাত সেটা শুনতে চান।

মজনু বলল, মৌলানা সাব যে দুই-দুইবার তওবা করাইলেন, কোনবারই এই হারামজাদা তওবা করে নাই। মৌলানা সাব তারে যে কথা বলছেন, হে মনে মনে উল্টা কথা বলেছে।

তোকে বলেছে কে?

হে নিজেই বলেছে। তওবা করলে জেবন শেষ এই জন্য।

বলিস কি?

হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।

মাগরেবের নামাজের পর বদরুল আলম সাহেব ইউনুসকে দেখতে গেলেন। ইউনুসের হাতের কাছে লাঠি। হারিকেন জ্বলছে।

কিরে তুই না-কি তওবা করস নাই?

ইউনুস চুপ করে রইল।

ক্যান করস নাই? আল্লাহর সাথে মশকরা? হারামজাদা, তুইতো বিরাট বদ।

ইউনুস ক্ষীণ স্বরে বলল, মরতে মন চায় না।

দীর্ঘ সময় বদরুল আলম সাহেব ইউনুসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার একটা পা ফুলে কোল বালিশের মত হয়ে গেছে। এই পায়েই বোধ হয় শিয়াল কামড়েছে।

ইউনুস বলল, আপনে যদি বলেন তাইলে আরেকবার ঠিকমত তওবা করি।

থাক, তার আর দরকার নাই। তোর যখন অতই বাঁচনের শখ, দেখি একটা চেষ্টা কইরা। চল, তোরে ময়মনসিং নিয়া যাই। দেখি কি অবস্থা।

ইউনুস মনে হয় কথাগুলি ঠিক বুঝতে পারে না। ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে থাকে।

বদরুল আলম সাহেব রাতেই মহিষের গাড়ির ব্যবস্থা করেন। প্রথমে যেতে হবে নেত্রকোণা, নেত্রকোণা থেকে ময়মনসিংহ। সেখানে ডাক্তাররা জবাব দিলে নিতে হবে ঢাকা।

মহিষের গাড়ি রওনা হল রাত আটটায়। অঞ্চলের সমস্ত মানুষকে অবাক করে দিয়ে তিনিও সংগে চললেন। অনেক দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটির ব্যাপার আছে। ছেলে ছোকরাদের উপর ভরসা করা যায় না।

ইউনুস?

জ্বে।

ঝুলে থাক। হাল ছাড়িস না, আমি আছি।

ইউনুসের চোখ দিয়ে পানি পড়ে। সে প্রাণপণে ঝুলে থাকতে চেষ্টা করে। মহিষের গাড়ি দ্রুত এগিয়ে যায়।

খাদক

আমি লোকটির বয়স আন্দাজ করার চেষ্টা করছি। তার তেমন প্রয়োজন ছিল না। লোকটির বয়সে আমার কিছু যায় আসে না। তবু প্রথম দর্শনেই কেন যেন বয়স জানতে ইচ্ছে করে। তবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, লোকটিকে বেশ ঘটা করে আনা হয়েছে। দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে আমার সামনে। আমাদের ঘিরে মোটামুটি একটা ভিড়। লোকটি জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ হাসি হাসি। সেই হাসির আড়ালে গোপন একটা অহংকারও আছে। কিসের অহংকার কে জানে।

খোন্দকার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় বললেন – এই সেই লোক।

আমি বললাম, কোন লোক?

খাদক।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, খাদক মানে?

খোন্দকার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, এর মধ্যেই ভুলে গেছেন? রাতে আপনাকে বললাম না – আমাদের গ্রামে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি আছে। নাম করা খাদক।

আমার কিছুই মনে পড়ল না। খোন্দকার সাহেব লোকটি ক্রমাগত কথা বলেন। তাঁর সব কথা মন দিয়ে শোনা অনেক আগেই বন্ধ করেছি। কাল রাতে খাদক খাদক বলে কি সব যেন বলছিলেন। এ-ই তাহলে সেই বিখ্যাত খাদক।

ও আচ্ছা।

আমি ভাল করে খাদকের দিকে তাকালাম।

রোগা বেঁটে খাটো একজন মানুষ। মাথায় চুল নেই। সামান্য গোঁফ আছে। গোঁফ এবং ভুরুর চুল সবই পাকা। পরিষ্কার একটা পাঞ্জাবী গায়ে। শুধু যে পরিষ্কার তাই না, ইস্ত্রী করা। পরনের লুঙ্গি গাঢ় নীল রঙের। পায়ে রবারের জুতা।

জুতা জোড়াও নতুন। সম্ভবত বাক্সে তুলে রাখা হয়। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পায়ে দেয়া হয়। যেমন আজ দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, আপনার নাম কি?

আমার নাম মতি। খাদক মতি।

এই বলেই সে এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে ছালাম করল। বুড়ো একজন মানুষ আমার পা ছুঁয়ে সালাম করবে, আমি এমন কোন সম্মানিত ব্যক্তি না। খুবই হকচকিয়ে গেলাম। অপ্রস্তুত গলায় বললাম, এসব কি করছেন?

লোকটি বিনয়ে নিচু হয়ে বলল, আপনি জ্ঞানী লোক, আমি আপনার পায়ের ধুলা। বলেই সে হাত কচলাতে লাগল। তার বলার ধরন থেকেই বুঝা যাচ্ছে এ-জাতীয় কথা সে প্রায়ই বলে। অতীতে নিশ্চয়ই অনেককে বলেছে। ভবিষ্যতেও বলার ইচ্ছা রাখে।

হুজুর, আপনি অনুমতি দিলে পায়ের কাছে একটু বসি।

আরে আসুন বসুন। অনুমতি আবার কিসের।

লোকটি বসে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। একবারও চোখ তুলল না। তার বিনয় একটা দেখার মত ব্যাপার।

আমার বিরক্তির সীমা রইল না। গত দু'দিন ধরে আমি এই অজ পাড়াগাঁয়ে আটকা পড়ে আছি। লঞ্চে এখান থেকে আটপাড়া যাওয়ার কথা। লঞ্চের দেখা নেই। আছি খোন্দকার সাহেবের পাকা দালানে। ইনি এই অঞ্চলের একজন পয়সাওয়ালা মানুষ। নিজের মায়ের নামে স্কুল দিয়েছেন। খোন্দকার সাহেব আমার অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয় কিন্তু তাতে কোন অসুবিধা নেই। আদর যত্নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে গ্রামের দর্শনীয় বস্তুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার পালা। অনেক দর্শনীয় জিনিস এর মধ্যে দেখে ফেলেছি। ভাঙ্গা কালীমন্দির, যেখানে কিছুদিন আগেও নাকি নরবলি হয়েছে। একটা অচিন বৃক্ষ। সে অচিন বৃক্ষটি নাকি এক যাদুকর কামরূপ থেকে এনে পুঁতেছেন। যার ফল খেয়ে যৌবন স্থির থাকে। তবে এই ফল এখনো কেউ খায়নি, কারণ গাছটায় ফল হচ্ছে না। তেঁতুল গাছের মত গাছ-দর্শনীয় কিছু নয়, তবু ভাব দেখালাম যে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য দেখছি।

একজন দর্শনীয় বস্তু এই মুহূর্তে আমার পায়ের কাছে মাথা নীচু করে বসে আছে। লোকটি নাকি বিখ্যাত খাদক। এক বৈঠকে আধমণ গোশত খেতে পারে।

আমি বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করছি না। কিন্তু খোন্দকার সাহেবের উৎসাহ সীমাহীন। তিনি অহংকার মেশানো গলায় বললেন, মতি মেডেল পেয়েছে তিনটা। এই, প্রফেসার সাহেবকে মেডেল দেখা।

মতি মিয়া পাঞ্জাবীর পকেট থেকে মেডেল বের করল। মনে হচ্ছে মেডেল তার পকেটেই থাকে কিংবা আমাকে দেখানোর জন্যে সঙ্গে করে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা মেডেল দিয়েছেন নেত্রকোনার সি,ও, রেভিন্যু, একটা আজিজিয়া স্কুলের হেডমাষ্টার। অন্যটিতে নাম ধাম কিছু লেখা নেই। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল- একজন লোক পরিমাণে বেশী খায় বলেই তাকে মেডেল দিতে হবে? দেশটা যাচ্ছে কোন দিকে?

খোন্দকার সাহেব বললেন, অনেক দূর দূর থেকে লোক এসে মতিকে হায়ার করে নিয়ে যায়।

কেন?

বাজির খাওয়া হয়। মতি যায়, বাজি জিতে আসে। বরযাত্রীরা সাথে করে নিয়ে যায়। মতি সঙ্গে থাকলে মেয়ের বাড়িতে খাওয়া শর্ট পড়ে। মেয়ের বাপের একটা অপমান

হয়। মেয়ের বাপের অপমান সবাই দেখতে চায়।

কিছু না বললে ভাল দেখায় না বলেই বললাম- ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

খোন্দকার সাহেব বললেন, মতির রোজগারও খারাপ না। হায়ার করতে হলে তার রেট হচ্ছে কুড়ি টাকা। দূরে কোথাও নিতে হলে নৌকায় আনা-নেয়ার খরচ দিতে হয়।

আমি বললাম, এইটাই কি প্রফেশন নাকি? আর কিছু করে না?

জবাব দিল মতি মিয়া। বিনয় বিগলিত গলায় বলল, খাওয়ার কাম ছাড়া কিছু করি না।

কর না কেন?

এক সাথে দুই তিনটা কাম করলে কোনটাই ভাল হয় না। আল্লাহতালা একটা বিদ্যা দিছে। খাওনের বিদ্যা। অন্য কোন বিদ্যা দেয় নাই।

আল্লাহতালার প্রদত্ত বিদ্যার অহংকারে মতি মিয়ার চোখ চিক চিক করতে লাগল। আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। পাগলের প্রলাপ না-কি? খোন্দকার সাহেব দরাজ গলায় বললেন, সন্ধ্যাবেলায় মতি মিয়ার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। নিজের চোখে দেখেন। শহরের দশজনের কাছে গল্প করতে পারবেন। গ্রাম দেশেও দেখার জিনিস আছে প্রফেসার সাব।

তাতো নিশ্চয়ই আছে। তবে ভাই, আমাকে দেখানোর জন্যে কিছু করতে হবে না। শুনেই আমার আক্কেল গুড়ুম।

না দেখলে কিছু বুঝবেন না । আধমণ রান্না করা গোশ্‌ত যে কতখানি সেটা দেখার পর বুঝবেন মতি মিয়া কোন পদের জিনিস। কি রে মতি, পারবি তো?

মতি হাসি মুখে বলল, আপনাদের দশ জনের দোয়া।

খাওয়ার পর দুই সের চমচমও খাবি । বিদেশী মেহমান আছে, দেখিস, বেইজ্জত যেন না হই। গ্রামের ইজ্জতের ব্যাপার।

আলহামদুল্লিলাহ। দরকার হইলে জেবন দিয়া দিমু।

একটা লোক জীবন বাজি রেখে খাবে আর আমি বসে বসে দেখব , এর মধ্যে আনন্দের কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না । ব্যাপারটা কুৎসিত। যদিও অনেক কুৎসিত দৃশ্য আমরা আগ্রহ করে দেখি। মেলায় বা সার্কাসে বিকলাঙ্গ বিকট দর্শন শিশুদের অনেকে আগ্রহ করে দেখতে আসে। এখানেও তাই হবে। মতি মিয়াকে ঘিরে ধরবে একদল মানুষ। তার সাথে আমাকেও বসে থাকতে হবে। উৎসাহ দিতে হবে। ভাগ্যিস সঙ্গে ক্যামেরা নেই। ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলতে হত।

গ্রামে বেশ সাড়া পড়ল বলে মনে হল। খোন্দকার সাথের একটা গরু জবাইয়ের ব্যবস্থা করলেন। চমচম আনতে লোক চলে গেল। খোন্দকার সাহেব বললেন, মতি আস্ত গরু খেতে পারবি? বিশিষ্ট মেহমান আছে। তাঁর সামনে একটা রেকর্ড হয়। ঢাকায় ফিরে উনি কাগজে লিখে দেবেন।

আমি ভয় পেয়ে বললাম, আস্ত গরু খাবার দরকার নেই। একটা কেলেংকারী হবে।

আরে না, মতিকে আপনি চেনেন না। ও ইচ্ছা করলে হাতী খেয়ে ফেলতে পারে। বিরাট খাদক। অতি ওস্তাদ লোক।

এ রকম ওস্তাদ বেশী না থাকাই ভাল। খেয়েই সব শেষ করে দেবে।

আরে না, খাওয়াবে কে বলেন ভাই? খাওয়ানোর লোক আছে? লোক নেই। খাওয়া-খাদ্যও নেই। এই যে গরু জবাই দিলাম তার দাম তিন হাজার টাকা। দেশের অবস্থা খুব খারাপরে ভাই।

রান্নার আয়োজন চলছে। মতি মিয়া বসে আছে আমার সামনে। হাসি হাসি মুখে। মাঝে মাঝে বিড়ি খাবার জন্যে বারান্দায় উঠে যাচ্ছে আবার এসে বসছে। আমি বললাম, এত যে খান, খাওয়ার টেকনিকটা কি?

মতি মিয়া নড়েচড়ে বসল, উৎসাহের সঙ্গে বলল– গোশত চিপা দিয়া রস ফেলাইয়া দিতে হয়। কিছুক্ষণ পর পর একটু কাঁচা লবণ মুখে দিতে হয়। পানি খাওয়া নিষেধ।

তাই নাকি?

জ্বি। আর চাবাইতে হয় খুব ভাল কইরা। গোশত যখন মুখের মধ্যে তূলার মত হয় তখন গিলতে হয়।

কায়দা কানুনতো অনেক আছে দেখি।

বসারও কায়দা আছে। বসতে হয় সিধা হইয়া যেন পেটের উপর চাপ না পড়ে।

এই সব শিখেছেন কোত্থেকে?

নিজে নিজে বাইর করছি জনাব। ওস্তাদ কেউ ছিল না। আমারে তুমি কইরা বলবেন। আমি আপনার গোলাম।

মতি মিয়া খুব আগ্রহ নিয়ে নানান ধরনের গল্প শুরু করল। সবই খাদ্য বিষয়ক। দু'বছর আগে কোন এক প্রতিমন্ত্রী নাকি নেত্রকোনা এসেছিলেন। মতি মিয়া তার সামনে আধমণ জিলেপী খেয়ে তাঁকে বিস্মিত করেছে।

খাইতে খুব কষ্ট হইছে জনাব।

কষ্ট কেন?

জিলাপীর ভিতরে থাকে রস। রসটা গণ্ডগোল করে।

মন্ত্রী সাহেব খুশী হয়েছিলেন?

জ্বি খুব খুশী। ছবি তুলেছিলেন । দুইশ টেকাও দিছেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। বলছিলেন ঢাকায় নিয়া যাবেন, পেসিডেন সাহেবের সামনে খাওনের ব্যবস্থা করবেন। পেসিডেন সাবরে খুশি করতে পারলে কপাল ফিরত। কথা ঠিক না?

খুব ঠিক । আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব কবি মানুষ। খুশী হলে হয়তো আপনাকে নিয়ে কবিতাও লিখে ফেলতেন। মতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

আমি বললাম, আপনার ছেলেমেয়ে কি? তারাও কি খাদক নাকি?

জ্বি না। তারা না-খাওন্তির দল। খাইতে পায় না। কাজ কামতো কিছু করি না, খাওয়ামু কি? তারা হইল গিয়ে আফনের দেখক।

সেটা আবার কি?

তারা দেখে। আমি যখন খাই,তখন দেখে। দেখনের মধ্যেও আরাম আছে।

মতি মিয়া বিমর্ষ হয়ে পড়ল। এই প্রথম বারান্দায় না গিয়ে আমার সামনেই বিড়ি ধরিয়ে খক খক করে কাশতে লাগল।

খাওয়া শুরু হল রাত দশটার দিকে। একটা হ্যাজাক জ্বালিয়ে উঠোনে খাবার আয়োজন হয়েছে। এই প্রচণ্ড শীতে কাঁথা গায়ে গ্রাম ভেঙ্গে লোকজন এসেছে। মতি মিয়া খালি গায়ে আসনপিড়ি হয়ে বসেছে। ধ্যানস্থ মূর্তির মতি মিয়ার ছেলেমেয়েগুলিকেও দেখলাম। পেট বের হওয়া হাড় জিরজিরে কয়েকটি শিশু। চোখ বড় বড় করে বাবার খাবার দেখছে। শিশুগুলি ক্ষুধার্ত। হয়ত রাতেও কোন কিছু খায় নি। মতি একবারও তার বাচ্চাগুলির দিকে তাকাচ্ছে না।

খোন্দকার সাহেব গ্রামের বিশিষ্ট কিছু লোকজনকে এই উপলক্ষে দাওয়াত করেছেন। স্কুলের হেডমাষ্টার, গ্রামীন ব্যাংকের ম্যানেজার, থানার ওসি সাহেব, পোষ্টমাষ্টার সাহেব। সামাজিক মেলামেশার একটি উপলক্ষ। বিশিষ্ট মেহমানদের জন্যে খাসী জবেহ্ হয়েছে। দস্তরখানা বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আলোচনার প্রধান বিষয় ইলেকশন। ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খোন্দকার সাহেব ইলেকশনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। এর আগেরবার হেরেছেন। এবার হারতে চান না। জিততে চান এবং দেশের কাজ করতে চান।

অতিথিরা রাত বারটার দিকে বিদেয় হলেন। জাঁকিয়ে শীতে পড়েছে। মতি মিয়াকে ঘিরে যারা বসে আছে তাদেরকে শীতে কাবু করতে পারছে না। খড়ের আগুন করা হয়েছে। সেই আগুনের চারপাশে সবাই বসে। শুধু মতি মিয়ার ছেলেমেয়েরা তার বাবার চারপাশে বসে আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার বাবার খাওয়া দেখছে। মতি মিয়া ফিরেও তাকাচ্ছে না। তার গা দিয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে। চোখ দু'টি মনে হচ্ছে একটু ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। আমার মনে হয় পিতলের এই বিশাল হাঁড়ির মাংস শেষ করবার আগেই লোকটা মারা যাবে। আমি হব মৃত্যুর উপলক্ষ। মনটাই খারাপ হয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটাই কুৎসিত। একদল ক্ষুধার্ত মানুষ একজনকে ঘিরে বসে আছে। সে খেয়েই যাচ্ছে।

খোন্দকার সাহেব এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। হাসি মুখে বললেন, কেমন দেখছেন?

ভালই।

বলছিলাম না বিরাট খাদক।

তাইতো দেখছি।

শুয়ে পড়েন। শেষ হতে দেরী হবে। সকাল দশটার আগে শেষ হবে না। এখন খাওয়া স্লো হয়ে যাবে।

তাই নাকি?

জ্বি। শেষের দিকে এক টুকরা গোশত গিলতে দশ মিনিট সময় নেয়।

আমি মতির দিকে তাকিয়ে বললাম, কি মতি খারাপ লাগছে?

জ্বে না।

খারাপ লাগলে বাদ দাও। বাকিটা তোমার বাচ্চারা খেয়ে নেবে।

খোন্দকার সাহেব বললেন, অসম্ভব — একটা রেকর্ড করছে দেখছেন না? তুমি চালিয়ে যাও মতি। ভাই, আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

আমি শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে অনেক চেষ্টা করলাম মতি মিয়ার চরিত্রে কিছু মানবিক গুণ ঢুকিয়ে দিতে। নানাভাবেই তা সম্ভব। রাত একটার দিকে যদি মতি মিয়া ঘোষণা করে –বাকি গোশত আমি আর খাব না। হার মানলাম। এখানে যারা আছে তারা খাক। তাহলেই হয়।

কিংবা দৃশ্যটা আরো হৃদয়স্পর্শী হয় যদি শেষ দৃশ্যটি এরকম হয়– মতি মিয়ার বাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে, একজন শুধু জেগে আছে। মতি মিয়া গোশতের শেষ টুকরাটি মুখে তুলে দিয়ে থমকে যাবে। মুখে না দিয়ে এগিয়ে দেবে শিশুটির দিকে। সবাই তখন চেঁচিয়ে উঠবে-কর কি কর কি? বাজিতে হেরে যাচ্ছ তো। এটাও খাও।

মতি মিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলবে– হারলে হারব।

আমি জানি বাস্তবে তা হবে না। সকাল দশটা হোক, এগারোটা হোক মতি মিয়া খাওয়া শেষ করবে। কোন দিকে ফিরেও তাকাবে না। এত কিছু দেখলে খাদক হওয়া যায় না।

অচিন বৃক্ষ

ইদরিশ বলল, ভাইজান ভাল কইরা দেহেন। এর নাম অচিন বৃক্ষ।

বলেই থু করে আমার পায়ের কাছে এক দলা থু থু ফেলল। লোকটির কুৎসিৎ অভ্যাস, প্রতিটি বাক্য দু'বার করে বলে। দ্বিতীয়বার বলার আগে একদলা থু থু ফেলে।

ভাইজান ভাল কইরা দেহেন, এর নাম অচিন বৃক্ষ।

অচিন পাখির কথা গানের মধ্যে প্রায়ই থাকে, আমি অচিন বৃক্ষের কথা এই প্রথম শুনলাম এবং দেখলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে এরা সবাই বৃক্ষ শব্দটা উচ্চারণ করছে শুদ্ধভাবে। তৎসম শব্দের উচ্চারণে কোন গন্ডগোল হচ্ছে না। অচিন বৃক্ষ না বলে অচিন গাছও বলতে পারত, তা বলছে না। সম্ভবত গাছ বললে এর মর্যাদা পুরোপুরি রক্ষিত হয় না।

ইদরিশ বলল, ভাল কইরা দেহেন ভাইজান, ত্রিভুবনে এই বৃক্ষ নাই।

তাই না-কি?

জ্বে। ত্রিভুবনে নাই।

ত্রিভুবনে এই গাছ নাই শুনেও আমি তেমন চমৎকৃত হলাম না। গ্রামের মানুষদের কাছে ত্রিভুবন জায়গাটা খুব বিশাল নয়। এদের ত্রিভুবন হচ্ছে আশে পাশের আট দশটা গ্রাম। হয়ত আশে পাশে এরকম গাছ নেই।

কেমন দেখতাছেন ভাইজান?

ভাল।

এই রকম গাছ আগে কোন দিন দেখছেন?

না।

ইদরিশ বড়ই খুশী হল। থু করে বড় একদলা থু থু ফেলে খুশীর প্রকাশ ঘটাল।

বড়ই আচানক, কি বলেন ভাইজান?

আচানক তো বটেই।

ইদরিশ এবার হেসে ফেলল। পান খাওয়া লাল দাঁত প্রায় সব ক'টা বের হয়ে এল। আমি মনে মনে বললাম, কী যন্ত্রণা! এই অচিন বৃক্ষ দেখার জন্যে আমাকে মাইলের উপরে হাঁটতে হয়েছে। বর্ষা কবলিত গ্রামের দু'মাইল হাঁটা যে কি জিনিস, যারা কোনদিন হাঁটেন নি তাঁরা বুঝতে পারবেন না। জুতা খুলে খালি পায়ে হাঁটতে হয়েছে। হুক ওয়ার্মের জীবাণু যে শরীরে ঢুকে গেছে সে বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত।

গাছটা দেখতাছেন কেমন কন দেহি ভাইজান?

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। এরা শুধু গাছ দেখিয়ে খুশী নয়, প্রশংসা সূচক কিছুও শুনতে চায়। আমি কোন বৃক্ষ প্রেমিক নই। সব গাছ আমার কাছে এক রকম মনে হয়। আশে পাশের মানুষদেরই আমি চিনি না, গাছ চিনব কি করে? মানুষজন তাও কথা বলে– নিজেদের পরিচিত করার চেষ্টা করে। গাছেরা তেমন কিছুই করে না।

অচিন বৃক্ষ কেমন দেখলেন ভাইজান?

আমি ভাল করে দেখলাম। মাঝারি সাইজের কাঁঠাল গাছের মত উঁচু। পাতাগুলি তেঁতুল গাছের পাতার মত ছোট ছোট। গাছের কাণ্ড পাইন গাছের কাণ্ডের মত মসৃণ। গাছ প্রসঙ্গে কিছু না বললে ভাল দেখায় না বলেই বললাম, ফুল হয়?

ইদরিশ কথা বলার আগেই, পাশে দাঁড়ানো রোগা লোকটা বলল, জ্বে না – ফুল ফুটনের 'টাইম' হয় নাই। 'টাইম' হইলেই ফুটবে। এই গাছে ফুল আসতে মেলা 'টাইম' লাগে।

বয়স কত এই গাছের?

তা ধরেন দুই হাজারের কম না। বেশীও হইতে পারে।

বলেই লোকটা সমর্থনের আশায় চারিদিকে তাকাল। উপস্থিত জনতা অতি দ্রুত মাথা নাড়তে লাগল। যেন এই সময়ে কারো মনেই সন্দেহের লেশ মাত্র নেই। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হলাম। গ্রামের লোকজন কথাবার্তা বলার সময় তাল ঠিক রাখতে পারে না। হুট করে বলে দিল দু'হাজার বছর। আর তাতেই সবাই কেমন মাথা নাড়ছে। আমি ইদরিশের দিকে তাকিয়ে বললাম, ইদরিশ মিয়া, গাছ তো দেখা হল, চল যাওয়া যাক।

আমার কথায় মনে হল সবাই খুব অবাক হচ্ছে।

ইদরিশ হতভম্ব গলায় বলল, এখন যাইবেন কি? গাছ তো দেখাই হইল না। তার উপরে, মাষ্টার সাবরে খবর দেওয়া হইছে। আসতাছে।

আমার চারপাশে সতেরো আঠারোজন মানুষ আর একপাল উলঙ্গ শিশু। অচিন বৃক্ষের লাগোয়া বাড়ি থেকে বৌ-ঝিরা উঁকি দিচ্ছে। একজন এককাঁদী ডাব পেড়ে নিয়ে এল। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, কালো রঙের বিশাল একটা চেয়ারও একজন মাথায় করে আনছে। এই গ্রামের এটাই হয়ত একমাত্র চেয়ার। অচিন বৃক্ষ যারা দেখতে আসেন তাদের সবাইকে এই চেয়ারে বসতে হয়।

অচিন বৃক্ষের নীচে চেয়ার পাতা হল। আমি বসলাম। একজন কে হাত পাখা দিয়ে আমাকে প্রবল বেগে হাওয়া করতে লাগল। স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলের হেডমাষ্টার সাহেব চলে এলেন। বয়স অল্প, তবে অল্প বয়সেই গাল টাল ভেঙ্গে একাকার। দেখেই মনে হয় জীবন যুদ্ধে পরাজিত একজন মানুষ। বেঁচে থাকতে হয় বলেই বেঁচে আছে। ছাত্র পড়াচ্ছেন। হেডমাষ্টার সাহেবের নাম মুহম্মদ কুদ্দুস। তাঁর সম্ভবত হাঁপানি আছে। বড় বড় করে শ্বাস নিচ্ছেন। নিজেকে সামলে কথা বলতে অনেক সময় লাগল।

স্যারের কি শইল ভাল?

জ্বি ভাল।

আসতে একটু দেরি হইল। মনে কিছু নিবেন না স্যার।

না মনে কিছু নিচ্ছি না।

বিশিষ্ট লোকজন শহর থাইক্যা অচিন বৃক্ষ দেখতে আসে-বড় ভাল লাগে। বিশিষ্ট লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়।

আপনি ভুল করছেন ভাই। আমি বিশিষ্ট কেউ নই।

এই তোমরা স্যারকে হাত পা ধোয়ার পানি দেও নাই, বিষয় কি?

হাত পা ধুয়ে কি হবে? আবার তো কাদা ভাঙতেই হবে।

হেডমাষ্টার সাহেব অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, খাওয়া দাওয়া করবেন না? আমার বাড়িতে পাক-শাক হইতেছে। চাইরটা ডাল-ভাত, বিশেষ কিছু নয়। গেরাম দেশে কিছু জোগাড় যন্ত্রও করা যায় না। বিশিষ্ট মেহমানরা আসেন। গত বৎসর ময়মনসিংহের এ ডি সি সাহেব আসছিলেন। এডিসি রেভিন্যু। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। অচিন বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে এক হাজার টাকা দেওয়ার ওয়াদা করলেন।

তাই না-কি?

জ্বি। অবশ্যি টাকা এখনো পাওয়া যায় নাই। এরা কাজের মানুষ। নানান কাজের চাপে ভুলে গেছেন আর কি। আমাদের মত ত না যে কাজ কর্ম কিছু নাই। এদের শতেক কাজ। তবু ভাবতেছি একটা পত্র দিব। আপনে কি বলেন?

দিন। চিঠি দিয়ে মনে করিয়ে দিন।

আবার বিরক্ত হন কি-না কে জানে। এরা কাজের মানুষ, চিঠি দিয়ে বিরক্ত করাও ঠিক না। এই চায়ের কি হইল?

চা হচ্ছে না-কি?

জ্বি, বানাতে বলে এসেছি। চায়ের ব্যবস্থা আমার বাড়িতে আছে। মাঝে মধ্যে হয়। বিশিষ্ট মেহমানরা আসেন। এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসার সাহেব এসেছিলেন- বিরাট জ্ঞানী লোক। এদের দেখা পাওয়া তো ভাগ্যের কথা, কি বলেন স্যার?

তা তো বটেই।

চা চলে এল।

চা খেতে খেতে এই গ্রামের অচিন বৃক্ষ কী করে এল সেই গল্প হেডমাষ্টার সাহেবের কাছে শুনলাম। এক ডাইনী না-কি এই গাছের উপর 'সোয়ার' হয়ে আকাশ পথে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার পানির পিপাসা হয়। এইখানে সে নামে। পানি খেয়ে তৃষ্ণা নিবারিত করে। পানি ছিল বড়ই মিঠা। ডাইনী তখন সন্তুষ্ট হয়ে গ্রামের লোকদের বলে- তোমাদের মিঠা পানি খেয়েছি তার প্রতিদানে এই গাছ দিয়ে গেলাম। গাছটা যত্ন করে রাখবে। অনেক অনেক দিন পরে গাছে ফুল ধরবে। তখন তোমাদের দুঃখ থাকবে না। এই গাছের ফুল সর্বরোগের মহৌষধ। একদিন উপাস থেকে খালি পেটে এই ফুল খেলেই হবে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আপনি এই গল্প বিশ্বাস করেন?

হেডমাষ্টার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, বিশ্বাস করব না কেন? বিশ্বাস না করার তো কিছু নাই।

যে যুগে মানুষ চাঁদে হাঁটাহাটি করছে সেই যুগে আপনি বিশ্বাস করছেন গাছে চড়ে ডাইনী এসেছিল?

জগতে অনেক আচানক ব্যাপার হয় জনাব। যেমন ধরেন ব্যাঙের মাথায় মণি। যে মণি সাত রাজার ধন। অন্ধকার রাতে ব্যাঙ এই মণি শরীর থেকে বের করে। তখন চারদিক আলো হয়ে যায়। আলো দেখে পোকারা আসে। ব্যাঙ সেই পোকা ধরে ধরে খায়।

আপনি ব্যাঙের মণি দেখেছেন?

জ্বি জনাব। নিজের চোখে দেখা। আমি তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

আমি চুপ করে গেলাম। যিনি ব্যাঙের মণি নিজে দেখেছেন বলে দাবী করেন তাঁর সঙ্গে কুসংস্কার নিয়ে তর্ক করা বৃথা। তাছাড়া দেখা গেল ব্যাঙের মণি তিনি

একাই দেখেন নি- 'আমার আশে পাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের অনেকেও দেখেছে।'

দুপুরে হেডমাষ্টার সাহেবের বাসাতে খেতে গেলাম। আমি এবং ইদরিশ। হেডমাষ্টার সাহেবের হত দরিদ্র অবস্থা দেখে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। প্রাইমারী স্কুলের একজন হেডমাষ্টার সাহেবের যদি এই দশা হয় তখন অন্যদের না-জানি কি অবস্থা। অথচ এর মধ্যেই পোলাও রান্না হয়েছে। মুরগীর কোরমা করা হয়েছে। দরিদ্র মানুষটির অনেকগুলি টাকা বের হয়ে গেছে এই বাবদে।

আপনি এসেছেন বড় ভাল লাগতেছে। অজ পাড়াগাঁয়ে থাকি। দু' একটা জ্ঞানের কথা নিয়ে যে আলাপ করব সেই সুবিধা নাই। চারদিকে মূর্খের দল। অচিন বৃক্ষ থাকায় আপনাদের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসেন। বড় ভাল লাগে। কিছু জ্ঞানের কথা শুনতে পারি।

বেচারা জ্ঞানের কথা শুনতে চায়। কোন জ্ঞানের কথাই আমার মনে এল না। আমি বললাম, রান্না তো চমৎকার হয়েছে। কে রেঁধেছে আপনার স্ত্রী?

জ্বি না জনাব। আমার কনিষ্ট ভগ্নি। আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থ। দীর্ঘ দিন শয্যাশায়ী।

সে- কি?

হার্টের ভাল্বের সমস্যা। ঢাকা নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তাররা বলেছেন, লাখ দুই টাকা খরচ করলে একটা কিছু করা যাবে। কোথায় পাব এত টাকা বলেন দেখি।

আমি চুপ করে গেলাম।

হেড মাষ্টার সাহেব সহজ ভঙ্গিতে বললেন, আপনি যখন আসছেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিব। সে শহরের মেয়ে। মেট্রিক পাশ।

তাই না-কি?

জ্বি। মেট্রিক ফার্ষ্ট ডিভিশন ছিল। টোটেল মার্ক ছয়'শ এগারো। জেনারেল অংকে পেয়েছে ছিয়াত্তর। আর চারটা নম্বর হলে লেটার হত।

হেড মাষ্টার সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

ওর আবার লেখালেখির শখ আছে।

বলেন কি?

শরীরটা যখন ভাল ছিল তখন কবিতা লিখত। তা এই মূর্খের জায়গায় কবিতার মত জিনিস কে বুঝবে বলেন? আপনি আসছেন দু'একটা পড়ে দেখবেন।

জ্বি নিশ্চয়ই পড়ব।

মহসিন সাহেব বলে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি একটি কবিতার কপি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন অনেক পত্রিকায় সাথে তাঁর যোগাযোগ আছে ছাপিয়ে দিবেন।

ছাপা হয়েছে?

হয়েছে নিশ্চয়ই। কবিতাটা ভাল ছিল, নদীর উপরে লেখা। পত্রিকা টত্রিকা তো এখানে কিছু আসে না। জনার উপায় নাই। একটা পত্রিকা পড়তে হলে যেতে হয় মশাখালির বাজার। চিন্তা করেন অবস্থা। শেখ সাহেবের মৃত্যুর খবর পেয়েছি দু'দিন পরে, বুঝলেন অবস্থা।

অবস্থা তো খারাপ বলেই মনে হচ্ছে।

তাও অচিন বৃক্ষ থাকায় দুনিয়ার সাথে একটা যোগাযোগ আছে। আসেন ভাইসাব, আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলেন। সে শহরের মেয়ে। ময়মনসিংহ শহরে পড়াশোনা করেছে।

আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। অপরিচিত অসুস্থ একজন মহিলার সঙ্গে আমি কী কথা বলব? ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে অচিন বৃক্ষ দেখতে যারা আসেন তাঁদের সবাইকে এই মহিলার সঙ্গেও দেখা করতে হয়।

মহিলার সঙ্গে দেখা হল।

মহিলা না বলে মেয়ে বলাই উচিত। উনিশ কুড়ির বেশী বয়স হবে না। বিছানার সঙ্গে মিশে আছে। মানুষ নয় যেন মিশরের মমি। বিশিষ্ট অথিতিকে দেখে তার মধ্যে কোন প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল না। তবে বিড় বিড় করে কী যেন বলল। হেডমাষ্টার সাহেব তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লেন। পরক্ষণেই হাসি মুখে বললেন- আপনাকে সালাম দিচ্ছে।

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। কিছু একটা বলতে হয় অথচ বলার মত কিছু পাচ্ছি না। মেয়েটি আবার বিড় বিড় করে কী যেন বলল, হেডমাষ্টার সাহেব বললেন-রেনু বলছে আপনার খাওয়া দাওয়ার খুব কষ্ট হল। ওর কথা আর কেউ বুঝতে পারে না। আমি পারি।

আমি বললাম, চিকিৎসা হচ্ছে তো? না-কি এম্নি রেখে দিয়েছেন?

হেডমাষ্টার সাহেব এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মেয়েটি বিড় বিড় করে আবারো কী যেন বলল। হেডমাষ্টার সাহেব বুঝিয়ে দিলেন-ও জিজ্ঞেস করছে অচিন বৃক্ষ দেখে খুশী হয়েছেন কি-না।

আমি বললাম হয়েছি। খুব খুশী হয়েছি।

মেয়েটি বলল, ফুল ফুটলে আরেকবার আসবেন। ঠিকানা দিয়ে যান। ফুল ফুটলে আপনাকে চিঠি লিখবে।

মেয়েটি এই কথাগুলি বেশ স্পষ্ট করে বলল, আমার বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। আমি বললাম, আপনি বিশ্রাম করুন, আমি যাই।

হেডমাষ্টার সাহেব আমাকে এগিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। আমি রাজী হলাম না। এই ভদ্রলোকের এখন উচিত তার স্ত্রীর কাছে থাকা । যত বেশী সময় সে তার স্ত্রীর পাশে থাকবে ততই মঙ্গল। এই মেয়েটির দিনের আলো যে নিভে এসেছে তা যে কেউ বলে দিতে পারে।

আমি এবং ইদরিশ ফিরে যাচ্ছি।

আসার সময় যতটা কষ্ট হয়েছিল ফেরার সময় ততটা হচ্ছে না। আকাশে মেঘ করায় রোদের হাত থেকে রক্ষা হয়েছে। তার উপর ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে। ইদরিশের সঙ্গে গল্প করতে করতে এগুচ্ছি।

আমি বললাম, হেডমাষ্টার সাহেব তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা করাচ্ছে না?

করাইতাছে । বিষয় সম্পত্তি যা ছিল সব গেছে পরিবারের পিছনে। অখন বাড়ি ভিটা পর্যন্ত বন্দক।

তাই না-কি?

জ্বি। এই মানুষটা পরিবারের জন্যে পাগল। সারা রাইত ঘুমায় না। স্ত্রীর ধারে বইস্যা থাকে। আর দিনের মধ্যে দশটা চক্কর দেয় অচিন বৃক্ষের কাছে ।

কেন?

ফুল ফুটেছে কি না দেখে । অচিন বৃক্ষের ফুল হইল অখন শেষ ভরসা।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

খেয়া ঘাটের সামনে এসে আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল। দেখা গেল হেডমাষ্টার সাহেব ছুটতে ছুটতে আসছেন। ছুটে-আসা জনিত পরিশ্রমে খুবই কাহিল হয়ে পড়া একজন মানুষ যার সারা শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। ছুটে আসার কারণ হচ্ছে স্ত্রীর কবিতার খাতা আমাকে দেখাতে ভুলে গিয়েছিলেন। মনে পড়ায় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন ।

আমরা একটা অশ্বত্থ গাছের ছায়ার নীচে বসলাম। হেডমাষ্টার সাহেবকে খুশী করার জন্যেই দু'নম্বরী খাতার প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত পড়ে বললাম,

খুব ভাল হয়েছে।

হেডমাষ্টার সাহেবের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন- এখন আর কিছু লিখতে পারে না। শরীরটা বেশী খারাপ।

আমি বললাম, শরীর ভাল হলে আবার লিখবেন।

হেডমাষ্টার সাহেব বললেন, আমিও রেনুরে সেইটাই বলি- অচিন বৃক্ষের ফুল ফুটারও বেশী বাকি নাই। ফুল ফুটার আগে পচা শ্যাওলার গন্ধ ছাড়ার কথা। গাছ সেই গন্ধ ছাড়া শুরু করেছে। আর কেউ সেই গন্ধ পায় না। আমি পাই।

আমি গভীর মমতায় ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি ইতস্তত করে বললেন, প্রথম কবিতাটা আরেকবার পড়েন স্যার। প্রথম কবিতাটার একটা ইতিহাস আছে।

কী ইতিহাস?

হেডমাষ্টার সাহেব লাজুল গলায় বললেন, রেনুকে আমি তখন প্রাইভেট পড়াই। একদিন বাড়ির কাজ দিয়েছি। বাড়ির কাজের খাতা আমার হাতে দিয়ে দৌড় দিয়া পালাইল। আর তো আসে না। খাতা খুইল্যা দেখি কবিতা। আমারে নিয়া লেখা। কী সর্বনাশ বলেন দেখি। যদি এই খাতা অন্যের হাতে পড়ত, কি অবস্থা হইত বলেন?

অন্যের হাতে পড়বে কেন? বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে দিবে আপনার হাতেই।

তা ঠিক। রেনুর বুদ্ধির কোন মা-বাপ নাই। কি বুদ্ধি কি বুদ্ধি। তার বাপ মা বিয়ে ঠিক করল- ছেলে পূবালী ব্যাংকের অফিসার । চেহারা সুরত ভাল। ভাল বংশ। পান চিনি হয়ে গেল। রেনু চুপ করে রইল। তারপর একদিন তার মারে গভীর রাতে ঘুম থেকে ডেকে বলল, মা তুমি আমারে বিষ জোগাড় কইরা দেও। আমি বিষ খাব। রেনুর মা বললেন, কেন? রেনু বলল- আমার পেটে সন্তান আছে মা। কতবড় মিথ্যা কথা, কিন্তু বলল ঠাণ্ডা গলায়। ঐ বিয়ে ভেঙ্গে গেল। রেনুর মা-বাবা তাড়াহুড়া করে আমার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। নিজের ঘরের কথা আপনাকে বলে ফেললাম, আপনি স্যার মনে কিছু নিবেন না।

না- আমি কিছু মনে করি নি।

সবাইরেই বলি । বলতে ভাল লাগে।

হেডমাষ্টারের চোখ চক চক করতে লাগল। আমি বললাম, আপনি ভাববেন না। আপনার স্ত্রী আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তিনি জড়ালো গলায় বললেন, একটু দোয়া করবেন স্যার । ফুলটা যেন তাড়াতাড়ি ফুটে।

পড়ন্ত বেলায় খেয়া নৌকায় উঠলাম। হেডমাষ্টার সাহেব মূর্তির মত ওপারে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেই এক ধরনের প্রতীক্ষার ভঙ্গি আছে। সেই প্রতীক্ষা অচিন বৃক্ষের অচিন ফুলের জন্যে। যে প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে হত-দারিদ্র গ্রামের অন্যসব মানুষরাও। এবং কী আশ্চর্য, আমার মত কঠিন নাস্তিকের মধ্যেও সেই প্রতীক্ষার ছায়া। নদী পার হতে হতে আমার কেবলি মনে হচ্ছে-আহা ফুটুক। অচিন বৃক্ষে একটি ফুল হলেও ফুটুক। কত রহস্যময় ঘটনাই তো এ পৃথিবীতে ঘটে। তার সঙ্গে যুক্ত হউক আরো একটি।

হেডমাষ্টার সাহেবও পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। তার হাতে হাতীর ছবি আঁকা দু'নম্বরী একটা কবিতার খাতা। দূর থেকে কেন জানি তাঁকে অচিন বৃক্ষের মত লাগছে। হাতগুলি যেন অচিন বৃক্ষের শাখা। বাতাস পেয়ে দুলছে।

পিপড়া

আপনার অসুখটা কী বলুন?

রুগী কিছু বলল না,পাশে বসে-থাকা সঙ্গীর দিকে তাকাল।

ডাক্তার নুরুল আফসার, এমআরসিপি, ডিপিএস,অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তাঁর বিরক্তির তিনটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, আটটা বেজে গেছে— রুগী দেখা বন্ধ করে বাসায় যেতে হবে। আজ তাঁর শ্যালিকার জন্মদিন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, গ্রাম থেকে আসা রুগী তিনি পছন্দ করেন না –এরা হয় বেশী কথা বলে, নয় একেবারেই কথা বলে না। ভিজিটের সময় হলে দর দাম করার চেষ্টা করে। হাত কচলে মুখে তেলতেলে ভাব ফুটিয়ে বলে — কিছু কম করা যায় না ডাক্তার সাব। গরীব মানুষ।

আজকের এই রুগীকে অপছন্দ করার তৃতীয় কারণটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবু নূরুল আফসার সাহেবের কাছে এই কারণটিই প্রধান বলে বোধ হচ্ছে। লোকটির চেহারা নির্বোধের মত। এই ধরনের লোক নিজের অসুখটাও ঠিক মত বলতে পারে না। অন্য একজনের সাহায্য লাগে।

বলুন, তাড়াতাড়ি বলুল। আমার অন্য কাজ আছে।

লোকটি কিছু বলল না। গলা খাকারী দিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল। ভাবখানা এরকম যে অসুখের কথা-বার্তা সঙ্গীটিই বলবে। সে-ও কিছু বলছে না। ডাক্তার নূরুল আফসার হাত ঘড়ির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বললেন, গরু ছাগল তার কী অসুখ বলতে পারে না। তাদের অসুখ অনুমানে ধরতে হয়। আপনি তো আর গরু ছাগল না। চুপ করে আছেন কেন? নাম কি আপনার ?

রুগী কিছু বলল না। তার সঙ্গী বলল, উনার নাম মকবুল। মোহম্মদ মকবুল হোসেন ভূঁইয়া।

নামটাও অন্য আরেকজনকে বলে দিতে হচ্ছে। আপনি কি কথা বলতে পারেন, না— পারেন না?

পারি।

কী নাম আপনার?

মোহম্মদ মকবুল হোসেন ভূঁইয়া।

বয়স কত?

বায়ান্ন।

আপনার সমস্যাটা কি?

রুগী মাথা নীচু করে ফেলল। নূরুল আফসার সাহেবের ধারণা হল অস্বস্তিকর কোন অসুখ, যার বিবরণ সরাসরি দেয়া মুশকিল।

আর তো সময় দিতে পারব না। আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। যদি কিছু বলার থাকে এক্ষুনি বলবেন। বলার না থাকলে চলে যান।

রুগী আবার গলা খাকাড়ি দিল।

তার সঙ্গী বলল, উনার অসুখ কিছু নাই।

অসুখ কিছু নেইতা এসেছেন কেন?

উনারে পিপড়ায় কামড়ায়।

কী বললেন?

পিপড়ায় কামড়ায়। পিপীলিকা।

ডাক্তারী করতে গেলে অধৈর্য হওয়া চলে না। রুগীদের সঙ্গে রাগারাগিও করা চলে না। এতে পশার কমে যায়। রোগের বিবরণ শুনে বিস্মিত হওয়াও পুরোপুরি নিষিদ্ধ। রোগের ধরন-ধারন যতই অদ্ভুত হোক ভান করতে হয় যে, এ জাতীয় রোগের কথা তিনি শুনেছেন এবং চিকিৎসা করে আরাম করেছেন। নূরুল আফসার সাহেব ডাক্তারীর এই সব সহজ নিয়ম কানুন নিষ্ঠার সঙ্গে মানেন। আজ মানতে পারলেন না। ধমকের স্বরে বললেন, পিপড়ায় কামড়ায় মানে?

রুগী পকেটে হাত দিয়ে একটুকরা কাগজ বের করে বলল, চিঠিটা পড়েন। চিঠির মধ্যে সব লেখা আছে।

কার চিঠি?

কাশেম সাহেব।

কাশেম সাহেব কে?

এমবিবিএস ডাক্তার। আমাদের অঞ্চলের। খুব ভাল ডাক্তার। উনি আপনার কাছে আমারে পাঠাইছেন। বলছেন নাম বললে আপনি চিনবেন। উনি আপনের ছাত্র।

নূরুল আফসার সাহেব কাশেম নামের কোন ছাত্রের নাম মনে করতে পারলেন না। কাশেম বহুল প্রচলিত নামের একটি। ক্লাসের প্রতি বছরই দু'একজন কাশেম থাকে। এ কোন কাশেম কে জানে।

স্যার চিনেছেন?

চিনি না বলাটা ঠিক হবে না। পুরানো ছাত্ররা রুগী পাঠায়। এদেরকে খুশী রাখা দরকার। কাজেই আফসার সাহেব শুকনো হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ চিনেছি। কি লিখেছে দেখি।

উনি স্যার আপনাকে সালাম দিয়েছেন।

আচ্ছা ঠিক আছে। দেখি চিঠিটা দেখি।

চিঠি দেখে ডাক্তার সাহেবের ভ্রু কুঞ্চিত হল। বাঙ্গালী জাতির সবচে দোষ হল —এরা কোন জিনিষ সংক্ষেপে করতে পারে না। দুই পাতার এক চিঠি ফেঁদে বসেছে। তিনি পড়লেন।

পরম শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমার সালাম জানবেন। আমি সেভেন্টি থ্রি ব্যাচের ছাত্র। আপনি আমাদের ফার্মাকোলজী পড়াতেন। আপনার বিষয়ে আমি সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছিলাম। সেই উপলক্ষে আপনি আপনার বাসায় আমাকে চায়ের দাওয়াত করেছিলেন।

আশা করি আপনার মনে পড়েছে। যাই হোক, আমি মকবুল সাহেবকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। মকবুল এই অঞ্চলের একজন অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তি। সে বছর চারেক ধরে অদ্ভুত এক ব্যাধিতে ভুগছে। একে ব্যাধি বলা যাবে না কিন্তু অন্য কোন নামও আমি পাচ্ছি না। ব্যাপারটা হচ্ছে তাকে সব সময় পিপড়ায় কামড়ায়।

বুঝতে পারছি বিষয়টা আপনার কাছে খুবই হাস্যকর মনে হচ্ছে। শুরুতে আমার কাছেও মনে হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম এটা এক ধরনের মানসিক ব্যধি। বর্তমানে আমার সেই ধারণা পুরোপুরি ভেঙ্গে গেছে। আমি নিজে লক্ষ করেছি মকবুল সাহেব কোথাও বসলেই সাড়ি বেঁধে পিপড়া তার কাছে আসতে থাকে।

পীর-ফকির, তাবিজ, ঝাড়-ফুঁক জাতীয় আধি ভৌতিক চিকিৎসা সবই করানো হয়েছে। কোন লাভ হয়নি। আমি কোন উপায় না দেখে আপনার কাছে পাঠালাম। অপনি দয়া করে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবেন না।

বিনীত

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র

আবুল কাশেম।

বুষ্টার ফার্মেসী। নান্দাইল। কেন্দুয়া।

ডাক্তার সাহেব রুগীর দিকে তাকালেন। রুগী পাথরের মত মুখ করে বসে আছে। গায়ে ফতুয়া ধরনের জামা। পরনে লুঙ্গী। অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তির পোষাক নয়।

ডাক্তার সাহেব কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। কিছু একটা বলতে হয় আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। এই জাতীয় উদ্ভট যন্ত্রণার কোন মানে হয়?

পিপড়া কামড়ায় আপনাকে?

জ্বি স্যার। কোন এক জায়গায় বসে থাকলেই পিপড়া এসে ধরে।

নূরুল আফসার সাহেব একবার ভাবলেন বলবেন, আপনি কি রসোগোল্লা না-কি যে পিপড়া ছেঁকে ধরবে? শেষ পর্যন্ত বললেন না।

বড় কষ্টে আছি স্যার। যদি ভাল করে দেন সারাজীবন কেনা গোলাম হইয়া থাকব। টাকা পয়সা খরচ কোন ব্যাপার না, স্যার। টাকা যা লাগে লাগুক।

আপনার কি অনেক টাকা?

জ্বি স্যার।

কী পরিমাণ টাকা আছে?

রুগী কোন জবাব দিল না। রুগীর সঙ্গী বলল, মকুবল ভাইয়ের কাছে টেকা পয়সা কোন ব্যাপার না। লাখ দুই লাখ উনার হাতের ময়লা।

নূরুল আফসার সাহেব এই প্রথম খানিকটা কৌতূহলী হলেন। লাখ টাকা ফতুয়া গায়ে লুঙ্গী পরা এই লোকটির হাতের ময়লা এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তিনি নিজেও ধনবান ব্যক্তি। ফিক্সড ডিপোজিটে তাঁর এগারো লাখ টাকার মত আছে। এই টাকা সঞ্চয় করতে গিয়ে জীবন পানি করে দিতে হয়েছে। ভোর ছ'টা থেকে রাত বারোটা এক মুহূর্তের বিশ্রাম নেই।

একমাত্র ছুটির দিন শুক্রবারটাও তিনি কাজে লাগান। সকালের ফ্লাইটে চিটাগাং যান লাষ্ট ফ্লাইটে ফিরে আসেন। ওখানকার একটা ক্লিনিকে বসেন। ঐ ক্লিনিকের তিনি কনসালটিং ফিজিসিয়ান। আর এই লোককে দেখে তো মনে হয় না সে কোন কাজ কর্ম করে। নির্বোধের মত এই লোক এত টাকা করে কী করে? নুরুল আফসার সাহেবের মেজাজ খারাপ হয় গেল।

মকবুল ক্ষীণ স্বরে বলল, রোগটা যদি সারায়ে দেন।

এটা কোন রোগ না। আমি এমন কোন রোগের কথা জানি না -যে রোগে দুনিয়ার পিপড়া এসে কামড়ায়। অসুখটা আপনার মনে। আমি সাইকিয়াট্রিষ্টের ঠিকানা লিখে দিচ্ছি – তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। আপনার যে সমস্যা এই সমসার সমাধান আমার কাছে নেই।

নূরুল আফসার সাহেব বাক্যটা পুরোপুরি শেষ করলেন না। কারণ একটা অদ্ভুত দৃশ্যে তাঁর চোখ আটকে গেল। তিনি দেখলেন, টেবিলের উপর রাখা মকবুলের ডান হাতের দিকে এক সাড়ি লাল পিপড়া এগুচ্ছে। পিপড়ারা সচরাচর এক লাইনে চলে, এরা তিনটি লাইন করে এগুচ্ছে।

ডাক্তার সাহেবের দৃষ্টি লক্ষ্য করে মকবুলও তাকাল পিপড়ার সাড়ির দিকে। সে কিছু বলল না, বা হাতও সরিয়ে নিল না।

নূরুল আফসার সাহেব বললেন, এই পিপড়াগুলি কি আপনার দিকে আসছে?

জ্বি স্যার।

বলেন কী?

পায়েও পিপড়া ধরেছে। এক জায়গায় বেশীক্ষণ বসতে পারি না স্যার।

নূরুল আফসার সাহেব কাছে এগিয়ে এলেন উচু হয়ে বসলেন। সত্যি সত্যি দু'সাড়ি পিপড়া লোকটির পার দিকে এগুচ্ছে।

মকবুল সাহেব।

জ্বি স্যার।

আমার একটা জরুরী কাজ আছে চলে যেতে হচ্ছে। আপনি কি কাল একবার আসবেন।

অবশ্যই আসব। যার কাছে যাইতে বলেন যাব। বড় কষ্টে আছি স্যার। রাত্রে ঘুমাইতে পারি না। নাকের ভিতর দিয়ে পিপড়া ঢুকে যায়।

আপনি কাল আসুন। কাল কথা বলব।

জ্বি আচ্ছা।

মকবুল উঠে দাঁড়াল। পর মুহূর্তেই যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্যে নূরুল আফসার সাহেব মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর কাছে মনে হল মকবুল কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বদ্ধ উম্মাদ হয়ে গেছে। চিন্তা ও বিচার শক্তি পুরোপুরি লোপ পেয়েছে। তিনি দেখলেন মকবুল হিংস্র ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে, পা ঘসে ঘসে পিপড়া মারার চেষ্টা করছে। এক পর্যায় সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেবিলে, দু'হাতে পিষে ফেলল পিপড়ার সাড়ি। মকবুলের মুখ ঘামে চট চট করছে চোখের তারা ঈষৎ লালাভ। মুখে হিস হিস শব্দ করছে এবং নীচু গলায় বলছে হারামজাদ, হারামজাদ।

তার সঙ্গী কিছুই বলছে না। মাথা নীচু করে সিগারেটের কাঠি দিয়ে দাঁত খুচাচ্ছে। তার ভাবভক্তি থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ জাতীয় ঘটনার সঙ্গে সে পরিচিত। এই ঘটনায় সে অস্বাভাবিক কিছু দেখছে না।

নূরুল আফসার সাহেব মলীর জন্মদিনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন। রুগীর দিকে হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দু'জন এ্যাসিসটেন্টও ছুটে এসেছে। তারা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখে মুখে বিস্ময়ের চেয়ে ভয় বেশী।

মকবুল হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেল। নীচু গলায় বলল, স্যার মনে কিছু নিবেন না। এই পিপড়ার ঝাঁক আমার জেবন শেষ কইরা দিছে। হারামজাদা পিপড়া। এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি দিবেন?

ডাক্তার সাহেবের এ্যাসিসটেন্ট অতি দ্রুত ফ্রিজ থেকে পানির বোতল বের করে নিয়ে এল। একজন ভয়ংকর পাগলের পাগলামী হঠাৎ থেমে গেছে এই আনন্দেই সে আনন্দিত।

মকবুল পানির গ্লাস হাতে নিয়ে বসে রইল পানি মুখে দিল না। মাথা নীচু করে বিড় বিড় করে বলল, যেখানে যাই সেইখানে পিপড়া, কি করব কন। যে খাটে ঘুমাই সেই খাটের পায়ার নীচে বিরাট বিরাট ঘটির সরা। সরা ভর্তি পানি। তাতেও লাভ হয় না।

লাভ হয় না?

জ্বি না। ক্যামনে ক্যামনে জানি বিছানায় পিপড়া উঠে। ঘন্টায় ঘন্টায় বিছানার চাদর বদলাতে হয়।

বলেন কি?

সত্যি কথা বলতেছি জনাব। এক বর্ণ মিথ্যা না। যদি মিথ্যা হয় তা হইলে যেন আমার শরীরে কষ্ট হয়। আমি জনাব এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকতেও পারি না। জায়গা বদল করতে হয়। আমার জীবন শেষ।

ডাক্তার সাহেব এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। যে লোকটিকে শুরুতে মনে হয়েছিল কথা বলতে পারে না, এখন দেখা যাচ্ছে সে প্রচুর কথা বলতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। গ্রামের লোকজনের প্রাথমিক ইনহিবিশন কেটে গেলে প্রচুর কথা বলে। প্রয়োজনের কথা বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনের কথাই বেশী বলে।

চিকিৎসায় কোন ত্রুটি করি নাই জনাব। কেরোসিন তেলে কর্পূর দিয়ে সেই জিনিস শারীরে মাখছি যদি গন্দে পিপড়া না আসে। প্রথম দুই একদিন লাভ হয় তারপর হয় না। পিপড়া আসে। এমন জিনিস নাই যে শরীরে মাখি নাই। যে যা বলেছে মাখছি। একজন বলল বাদুরের গু শরীরে মাখলে আরাম হতো। সেই বাদুরের গুও মাখলাম। এরচেয়ে জনাব আমার মরণ ভাল।

ডাক্তার সাহেব তার এ্যাসিসটেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাসায় টিলিফোন করে দাও যে আমি একটা ঝামেলায় আটকে পড়েছি। আসতে দেরী হবে। আর

আমাদের চা দাও।

আপনি চা খান তো?

জ্বি চা খাই।

চা খেতে খেতে বলুন কী ভাবে এটা শুরু হল, প্রথম কখন পিপড়া আপনার দিকে আকৃষ্ট হল।

একটু গোপনে বলতে চাই জনাব।

গোপনে বলার ব্যাপার আছে কি?

জ্বি আছে।

বেশ গোপনেই বলবেন। আগে চা খান।

লোকটি চা খেল নিঃশব্দে। চা খাবার সময় একটি কথাও বলল না। তার কথা বলার ইচ্ছা সম্ভবত ঢেউয়ের মত আসে। ঢেউ যখন আসে তখন প্রচুর বক বক করে, ঢেউ থেমে গেলে চুপ চাপ হয়ে যায়। তখন কথা বলে তার সঙ্গী। এখন সঙ্গীই কথা বলছে—

ডাক্তার সাব, সবচে বেশী ফল হয়েছে যে চিকিৎসায় সেইটাই তো বলা হয় নাই। মকবুল ভাই, ঐ চিকিৎসার কথা বলেন।

তুমি বল।

এই চিকিৎসা মকবুল ভাই নিজেই বাইর করছে। বিষে বিষক্ষয় চিকিৎসা। গুড়ের গন্ধে পিপড়া সবচে বেশী আসে। মকবুল ভাই করলেন কি, সারা শইলে গুড় মাখলেন। এতে লাভ হইছিল। সাতদিন কোন পিপড়া আসে নাই।

মকবুল গম্ভীর গলায় বলল, সাতদিন না পাঁচদিন।

ডাক্তার সাহেব বললেন, পাঁচদিন পরে আবার পিপড়া আসা শুরু হল?

জ্বি।

পিপড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে মনে হয় অনেক কিছু করেছেন।

জ্বি। নদীর মাঝখানে নৌকা নিয়া কয়েকদিন ছিলাম। তিন দিন আরামে ছিলাম। চাইর দিনের দিন পিপড়া ধরল।

সেখানে পিপড়া গেল কি ভাবে?

জানি না জনাব। অভিশাপ।

কিসের অভিশাপ?

আপনারে গোপনে বলতে চাই।

ডাক্তার সাহেব গোপনে বলার ব্যবস্থা করলেন। পুরু ব্যাপারটায় তিনি এখন উৎসাহ পেতে শুরু করেছেন। শালীর জন্মদিনের কথা মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে। খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছেন। এই পযর্ন্তই। কোন রুগীর ব্যাপারে এ জাতীয় কৌতূহল তিনি এর আগে বোধ করেন নি। অবশ্যি এই লোকটিকে রুগী বলতেও বাধছে। কাউকে পিপড়া ছেঁকে ধরে এটা নিশ্চয়ই কোন রোগ ব্যধির পর্যায়ে ফেলা যাবে না।

ঘর থেকে সবাইকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। মকবুলের সঙ্গীও নেই। দরজা ভেজানো। মকবুল নীচু গলায় কথা শুরু করল–

জনাব, আপনেরে আমি আগেই বলছি আমি টাকা পয়সা ওয়ালা লোক। আমাদের টাকা পয়সা আইজ কাইলের না। ব্রিটিশ আমলে আমার দাদাজান পাকা দালান দেন। দাদাজানের দুইটা হাতী ছিল একটার নাম ময়না অন্যটার নাম সুরভী। দুইটাই মাদী হাতী।

ঐ প্রসঙ্গ থাক, আপনার পিপড়ার প্রসঙ্গে আসুন।

আসতেছি। আমি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক। টাকা পয়সা, ক্ষমতা এইসব জিনিস বেশী থাকলে মানুষের স্বভাব চরিত্র ঠিক থাকে না। আমারো ঠিক ছিল না। আপনারা যারে চরিত্র দোষ বলেন তাই হইল। পনের ষোল বছর বয়সেই। বিরাট বাড়ি— সুন্দরী মেয়েছেলের অভাব ছিল না। দাসী বাঁদি ছিল। দরিদ্র আত্মীয় স্বজনের মেয়ে বউরা ছিল।

আমারে একটা কঠিন কথা বলার বা শাসন করার কেউ ছিল না। আমার মা অবশ্য জীবিত ছিলেন। কেউ কেউ তার কাছে বিচার নিয়ে গেছে। লাভ হয় নাই। উল্টা আমার ধমক খাইছে।

আপনি বিয়ে করেন নি?

জ্বি বিবাহ করেছি। বিবাহ করব না কেন? দুটি বিবাহ করেছি। সন্তানাদি আছে। স্বভাব নষ্ট হইল বিয়ে সাদী করলেও ফয়দা হয় না। মেয়েছেলে দেখলেই.........

আপনি আসল জায়গায় আসুন। আজে বাজে কথা বলে বেশী সময় নষ্ট করছেন।

জ্বি আসতেছি। বছর পাঁচেক আগে আমার দূর সম্পর্কীয় এক বোনের মেয়ের উপর আমার চোখ পড়ল। চইদ্দ পনের বছর বয়স। গায়ের রঙ একটু ময়লা, কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল। আমার চরিত্র তো কারো অজানা না। মেয়ের মা

মেয়েকে আগলায়ে রাখে। খুবই বজ্জাত মা, মেয়েকে নিয়ে আমার মা'র ঘরে মেঝেতে ঘুমায়। এত কিছু কইরাও লাভ হইল না। এক রাতে ঘটনা ঘটে গেল।

কি বললেন, ঘটনা ঘটে গেল?

জ্বি।

আশ্চর্য ব্যাপার । আপনি যে ভাবে বলছেন তাতে মনে হচ্ছে খুবই তুচ্ছ একটা ব্যাপার।

জিনিসটা তুচ্ছই । কিছুই না । হে হে হে।

হাসবেন না। হাসির কোন ব্যাপার না।

জ্বি আচ্ছা। তারপর কি হল – ঐ বজ্জাত মা সেই রাইতেই মেয়েটারে ইঁদুর মারা বিষ খাওয়াইয়া দিল। আর নিজে একটা দড়ি নিয়ে বাড়ির পিছনে একটা আমগাছে ফাঁস নিল। আমারে বিপদে ফেলার চেষ্টা। আর কিছু না। মাগী চূড়ান্ত বজ্জাত। আমি চিন্তায় পড়লাম । দুইটা মিত্যু সোজা কথা না। থানা পুলিশ হবে। পুলিশ তো এই জিনিসটাই চায়। এরা বলবে খুন করা হয়েছে।

আপনি খুন করেন নি?

আরে না। খুন করব কি জন্যে। আর যদি খুনের দরকারও হয় নিজের ঘরে খুন করব? কাউরে খুন করতে হইলে জায়গার অভাব আছে? খুন করতে হয় নদীর উপরে। রক্ত ধুইয়ে বয়ে যায়। তারপর লাশ বস্তার ভিতর বইরা চূন মাখায়ে চার পাঁচটা ইট বস্তার ভিতর দিয়ে বিলে ফালায়ে দিতে হয়। এই জন্মের নিশ্চিন্ত । কোনো সম্বুদ্ধির পুত কিছু জানব না।

আপনি খুনও করেছেন?

জ্বি না। দরকার হয় নাই । যেটা বলতেছিলাম সেইটা শুনেন, ঘরে দুইটা লাশ। আমি বললাম, খবরদার লাশের গায়ে কেউ হাত দিবা না।

যে রকম আছে সে রকম থাক, আমি নিজে গিয়ে থানায় ওসি সাহেবেরে আনতেছি, ওসি সাহেব আইয়্যা যা করবার করব। থানা আমার বাড়ি থাইক্যা পনের মাইল দূর। পানসি নৌকা নিয়া গেলাম। দারগা সাহেব আর থানা ষ্টাফের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা নজরানা নিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি বিরাট সমস্যা। দারোগা সাব গিয়েছেন বোয়ালখালী ডাকাতি মামলার তদন্তে । ফিরলেন পরের দিন। তারে নিয়ে আমার বাড়িতে আসতে লাগল তিন দিন।

বর্ষাকাল। গরমের দিন। তিন দিনেই লাশ গেছে পচে। বিকট গন্ধ। দারোগা সাবরে নিয়া কাঁঠাল গাছের কাছে দেখি অদ্ভুদ দৃশ্য। লাখ লাখ লাল পিপড়া

লাশের শরীরে। মনে হইতেছে মাগীর সারা সইলে লাল চাদর।

মেয়েটারও একই অবস্থা। মুখ হাত পা কিছুই দেখার উপায় নাই। পিপড়ায় সব ঢাকা। মাঝে মাঝে সবগুলি পিপড়া যখন একসঙ্গে নড়ে, তখন মনে হয় লাল চাদর কেউ যেন ঝাড়া দিল।

ডাক্তার সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, আপনি তো দেখি খুবই বদলোক।

জ্বি না, আমার মত টেকা পয়সা যারার থাকে তারা আরো বদ হয়। আমি বদ না। তারপর কি ঘটনা সেইটাই শুনেন– আমি একটা সিগারেট ধরাইলাম। সিগারেটের আগুন ফেলার সাথে সাথে মেয়েটার শরীরের সবগুলি পিপড়া নড়ল। মনে হল যেন একটা বড় ঢেউ উঠল। তারপর সবগুলি পিপড়া একসঙ্গে মেয়েটারে ছাইড়া মাটিতে নামল। মেয়েটার চোখ মুখ সব খাইয়া ফেলেছে– জায়গায় জায়গায় হাড্ডি বের হয়ে গেছে। দারোগা সাহেব রুমাল দিয়ে নাক চেপে ধরে বললেন– মাবুদে এলাহী। তারপর অবাক হয়ে দেখি সবগুলি পিপড়া একসঙ্গে আমার দিকে আসতেছে। ভয়ংকর অবস্থা। আমি দৌড় দিয়ে বাইরে আসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে পিপড়াগুলি বাইরে আসল। মনে হইল আমারে খুঁজতেছে। সেই থাইক্যা শুরু। যেখানে যাই পিপড়া। জনাব আপনার এই ঘরে কি সিগারেট খাওয়া যায়? খাওয়া গেলে একটা সিগারেট খাইতে চাই।

খান।

শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

মকবুল সিগারেট ধরাল। তার মুখ বিষণ্ণ। সে আনাড়িদের মত ধুঁয়া ছাড়ছে। খুক খুক করে কাশছে। খানিকটা দম নিয়ে বলল– আমার কাশি ছিল না। এখন কাশি হয়েছে। নাকের ভিতর দিয়া পিপড়া ঢুকে গেছে ফুসফুসে। ওরা ঐখানেই বসবাস করে। ক্যামনে বুঝলাম জানেন? কাশির সাথে রক্ত আসে। আর আসে মরা পিপড়া।

ডাক্তার সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

মকবুল সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, সিগারেট খাইতেছি যাতে ভাল মত কাশি উঠে। কাশি উঠলে কাশির সাথে পিপড়া ও পিপড়ার ডিম বাইর হবে। আপনি দেখবেন নিজের চোখে। আমি ঘোষণা দিচ্ছি, যে আমারে পিপড়ার হাত থাইক্যা বাঁচাইব তারে আমি নগদ দুই লাখ দিব। আমি বদ লোক হইতে পারি কিন্তু আমি কথার খেলাপ করি না। আমি টাকা সাথে নিয়া আসছি। আপনে আমারে বাঁচান।

ডাক্তার সাহেব কিছু বললেন না। তিনি তার বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপরের কাচের দিকে তাকিয়ে আছেন। মকবুলের বাম হাত টেবিলের উপর। দুই

সাড়ি পিপড়া টেবিলের দু'প্রান্ত থেকে সেই হাতের দিকে এগুচ্ছে। মকবুলেরও সেই দিকে চোখ পড়ল। সে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনের কিছু করা সম্ভব না। ঠিক না ডাক্তার সাব?

হ্যাঁ ঠিক।

আমি জানতাম। আমার মরণ পিপড়ার হাতে।

মকবুল মন্ত্র মুগ্ধের মত এগিয়ে আসা পিপড়ার সাড়ি দু'টির দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ চক চক করছে। সে তার বাঁ-হাত আরেকটু এগিয়ে দিয়ে নীচু গলায় বলল,– নে খা।

পিপড়ারা মনে হল একটু থমকে গেল। গা বেয়ে উঠল না–কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তায় ভুগল।

মকবুল বলল, নিজ থাইক্যা খাইতে দিলে এরা কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরে উঠে না। শলা-পরামর্শ করে। এই দেহেন ডাক্তার–সাব উঠতেছে না।

তাই তো দেখছি।

দুই এক মিনিটের ব্যাপার। দুই এক মিনিট শলা পরামর্শ শেষ হইব, তখন শইল্যে উঠা শুরু হইব।

হলও তাই। ডাক্তার সাহেব লক্ষ্য করলেন, পিপড়ার দল মকবুলের বাঁ হাতেই উঠতে শুরু করেছে। দু'টি সাড়ি ছাড়াও নতুন এক সাড়ি পিপড়া রওনা হয়েছে। এই পিপড়াগুলির মুখে ডিম। ডাক্তার সাহেব ভেবে পেলেন না, মুখে ডিম নিয়ে পিপড়াগুলি যাচ্ছে কেন? এরা চায় কী? কে তাদের পরিচালিত করছে? কে সেই সূত্রধর?

অপেক্ষা

বশির মোল্লার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে তিনি কোন কিছুতেই রাগ করেন না। রেগে যাবার মত কোন ঘটনা যখন ঘটে, তিনি সারা চোখে মুখে উদাস এক ধরনের ভাব ফুটিয়ে মৃদু গলায় বলেন —আচ্ছা, আচ্ছা।

না রাগার মহৎ গুনের জন্যে তিনি পরপর তিন বার ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হয়েছেন। বাড়িতে পাকা দালান তুলেছেন। দশ বছর আগে জমির পরিমান যা ছিল আজ তা বেড়ে তিন গুণ হয়েছে। সম্প্রতি একটি পাওয়ার টিলার কিনেছেন। অনেক দূর দূর থেকে মানুষজন চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ির বারান্দায় পলিথিনের কাগজে ঢেকে রাখা যন্ত্রটি দেখতে আসে। বশির মোল্লা যন্ত্রটি এখনো মাঠে নামান নি। এই সবই সম্ভব হয়েছে তাঁর 'না রাগা' স্বভাবের জন্যে, মোলায়েম কথাবার্তার জন্যে। অন্তত বশির মোল্লার নিজের তাই ধারণা।

শ্রাবণ মাসের সকাল।

দুদিন আগে প্যাঁচপ্যাঁচ বৃষ্টি শুরু হয়েছে এখনো শেষ হয়নি। আকাশ ঘোলাটে। মনে হচ্ছে দুপুরের আগে বৃষ্টি কমবে না।

বশির মোল্লা বাংলা ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে কাত হয়ে আছেন। নানান কারণে তার মন বিক্ষিপ্ত। আশে পাশে ডাকাতী হচ্ছে। তাঁর বাড়িতেও হতে পারে। এখন পর্যন্ত কেন হয়নি সেটাই রহস্য। অবশ্যি একটি দোনলা বন্দুক তাঁর আছে। বন্দুকের অস্তিত্ব জানান দেবার জন্যে পাখি শিকারের নাম করে পরশু সকালেই তিনটা গুলি করলেন। কাজটা ঠিক হল কিনা তাও বুঝতে পারছেন না। হিতে বিপরিত হতে পারে। বন্দুকের লোভে ডাকাত আসতে পারে। ডাকাতের দুঃশ্চিন্তা ছাড়াও অন্য আরেকটি দুঃশ্চিন্তা তাঁকে কাবু করে ফেলেছে তিনি ঝোঁকের মথায় গত বৎসর আরেকটি বিয়ে করে ফেলেছেন। মেয়েটির বয়স অল্প। কিছুতেই পোষ মানছে না। তাঁর নিজের বয়স পঁয়তাল্লিশ। এই বয়সে সতের বছরের তরুনীর মন ভুলাবার জন্যে যে সব ঢং করতে হয় তা করা বেশ কষ্ট। তবু তিনি করার চেষ্টা করছেন — লাভ হচ্ছে না। মেয়েটি পোষ মানছে না।

আজ সকালে তাঁর মনের অবস্থা শ্রাবণ মাসের আকাশের মতই ঘোলাটে। অবশ্যি তাঁর মুখ দেখে কেউ তা বুঝতে পারবে না। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি বৃষ্টি ভেজা সকালের অবসর বেশ উপভোগ করছেন। ভেতরের বাড়িতে চায়ের কথা বলা হয়েছে। চা এখনো আসে নি। এই বাড়িতে শহরের বাড়ি ঘরের মত দুবেলা চা হয়। খবরের কাগজ আসে। দুদিন দেরী হয় তবে নিয়মিত আসে।

বশির মোল্লার কোলে খবরের কাগজ পড়ে আছে। তবে তিনি কাগজ পড়ছেন না। কাগজ পড়তে তাঁর একেবারেই ভাল লাগে না। ছবিগুলি দেখেন। ছবির নীচের লেখাগুলিও সব সময় পড়া হয়না। পড়তে ভাল লাগে না। বশির মোল্লা অলস চোখে খবরের কাগজের একটা ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন। ছবিতে এরশাদ সাহেবকে একজন বৃদ্ধের কাঁধে হাত রেখে কি যেন বলতে দেখা যাচ্ছে। গুচ্ছ গ্রাম ট্রাম হবে। একেক প্রেসিডেন্ট এসে একেকটা কায়দা করেন। জিয়া সাহেব খাল কাটিয়ে গেছেন। ইনি বানাচ্ছেন গুচ্ছ গ্রাম। পরের জন এসে কি করবে কে জানে।

'পেসিডেন সাব।'

বশির মোল্লা, খবরের কাগজ থেকে চোখ তুললেন। এদিকের সবাই তাঁকে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদের সুবাদে প্রেসিডেন্ট সাব ডাকে। তাঁর ভালই লাগে। আজ লাগল না, কারণ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেরামত। কেরামত তাঁর বাড়ির কামলা দশ বছর বয়স থেকেই আছে। এখন বয়স হয়েছে ত্রিশ পয়ত্রিশ। বোকা ধরনের মানুষ। এরা কামলা হিসাবে অসাধারণ হয়। যা করতে বলা হয় মুখ বুজে করে। বশির মোল্লা কেরামতকে দেখে বিরক্ত হলেন কারণ কেরামতের এখন ক্ষেতে থাকার কথা। তাঁর সামনে ঘুর ঘুর করার কথা না।

কিছু বলবি না-কি রে কেরামত?

একটা কথা ছেল।

বলে ফেল।

কেরামত মাথা নীচু করে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, বয়সতো হইল। এখন যদি একটা বিবাহ দিয়া দেন। ঘর সংসার করি। ঘর সংসার করতে মন চায়।

বশির মোল্লা বিস্মিত স্বরে বললেন, বিয়ে করতে চাস?

কেরামত গলার স্বর আরো নীচে নামিয়ে বলল, বয়স হইতাছে। ঘর সংসার করতে ইচ্ছা হয়। নবিজীও বয়সকালে বিবাহের কথা বলেছেন, হাদিস কোরানে আছে।

পছন্দের কেউ আছে না– কি?

না। আপনে দেখাশোনা কইরা ....

আচ্ছা ঠিক আছে হবে। আমিই ব্যবস্থা করব। ঘর তুলে দিব। জমিও দিয়ে দিব। বেতনতো কিছু নেস না– সব জমা আছে। ব্যবস্থা করে দিব।

জ্বে আচ্ছা।

এখন যা কাজে যা। কাজ ফালায়া আসা ঠিক না।

জ্বে আচ্ছা

বিয়ের কথা বারবার আমারে বলারও দরকার নাই। আমার মনে থাকব। সুবিধামত ব্যবস্থা করব। বিয়া সাদী তাড়া হুড়ার ব্যাপার না।

জ্বে আচ্ছা।

রাতে পাহরার ব্যাপারটা ঠিক আছেতো? খুব সাবধান। দল বাইন্ধা লাঠি শরকি হাতে পাহারা দিবি।

জ্বে আচ্ছা।

পরের তিন বৎসর বশির মোল্লার উপর দিয়ে নানান বিপদ আপদ গেল। জমি সংক্রান্ত এক মামলায় জড়িয়ে থানা পুলিশে অনেক টাকা গচ্চা গেল। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী এক মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে নিজেও মরমর হল। দীর্ঘদিন তাকে ঢাকায় রেখে চিকিৎসা করতে হল। তাঁর বাড়িতে একবার ডাকাতীও হল। তারচে বড় কথা তাঁর অতি মোলায়েম স্বভাব সত্বেও তিনি পরপর দুটি ইলেকশনে হেরে গেলেন। স্কুলের কমিটির নির্বাচন এবং পৌরসভার নির্বাচন। এই রকম অবস্থায় মেজাজ ঠিক থাকে না। কাজেই কেরামত আবার যখন বিয়ের প্রস্তব তুলল তিনি রেগে গিয়ে বললেন, তুই এমন বিয়ে পাগলা হলি কেন বলতো? এই অবস্থায় বিয়ের কথা তুললি কি ভাবে?

কেরামত বলল, তিন বচ্ছর পার হইছে পেসিডেন্ট সাব।

আমার অবস্থা তুই দেখবি না? তুই কি বাইরের লোক? তুই ঘরের লোক না? একটু সামলে উঠি তারপর ব্যবস্থা করব।

জ্বে আচ্ছা।

তোর তো ঘর দোয়ারও লাগব। বউ এনে তুলবি কোথায়? একটু সামলে উঠি

তারপর তোকে জমিজমা লিখে দিব। তখন বিয়ে হবে,তাড়াহুড়ার কোন ব্যাপার না।

জ্বে আচ্ছা।

নিজের মনে কাম করে যা। তোর বিয়ের চিন্তা তোর করা লাগবে না। আমি আছি কি জন্যে? একটু সামলে উঠি।

বশির মোল্লা পাঁচ বছরের মাথাতেই সামলে উঠলেন। বেশ ভাল ভাবেই সামলে উঠলেন। স্কুল কমিটির সভাপতি হলেন। উপজেলা ইলেকশনে জিতলেন। রোয়াইল বাজারে বাড়ি বানালেন। গ্রামের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে এলেন। তবে গ্রামের বাড়িতে এখন তিনি বেশী থাকেন না। রোয়াইল বাজারেই থাকেন। তার মনের শান্তি ফিরে এসেছে। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী আরো একটি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে পুরোপুরি পোষ মেনে গেছে। পৌষ মাসের এক সন্ধ্যায় বশির মোল্লা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। দিন তিনেক থাকবেন। আজকাল এক নাগারে বেশীদিন গ্রামের বাড়িতে থাকা হয়না। শহরের নানান কাজকর্ম থাকে। কাজকর্ম ফেলে গ্রামের বাড়িতে পড়ে থাকা সম্ভব না। তাছাড়া বেশ কিছু শত্রু তৈরী হয়েছে এরা কখন কি করে বসে, শহরে সেই সুযোগ কম।

বাড়িতে পা দেয়া মাত্র কেরামতের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, তুইতো দেখি বুড়ো হয়ে যাচ্ছিসরে কেরামত।

কেরামত মাথা নীচু করে ফেলল। যেন বুড়ো হয়ে যওয়া একটা অপরাধ। বশির মোল্লা বললেন, না এবার তোর বিয়েটা দিয়ে দিতে হয়— দেখি এই শ্রাবণেই ব্যবস্থা করব। বিয়ে শাদীর জন্যে শ্রাবণ মাস ভাল।

কেরামত ক্ষীন স্বরে বলল, জ্বে আচ্ছা।

তুই একটা ঘর তুলে ফেল। পুস্কুনীর উত্তর পাড়ে যে জায়গাটা আছে ঐ খানে। বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ যা লাগে নে। ঘরটা আগে হউক।

জ্বে আচ্ছা।

বিয়ে একটু বেশী বয়সে হওয়াই ভাল বুঝলি কেরামত এতে মিল মহব্বত ভাল হয়। তুই ঘর তুলে ফেল। উপরে ছন দিয়ে দিস। ছনের টাকা নিয়ে যাস। তোর তো টাকা পাওনাই আছে।

বশির মোল্লা তিন দিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন থাকতে হল সাত

দিন। স্কুল কমিটির কিছু সমস্যা ছিল সমস্যা মেটাতে হল। ফুড ফর ওয়ার্ক প্রগ্রামে একশ মন গম এসেছিল সেখানে থেকে সত্তুর মন গমের হিসাব পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটাও ঠিক ঠাক করতে হল। কয়েকটা গ্রাম্য সালিশী করতে হল। দেখতে দেখতে সাতদিন কেটে গেল। শহরে ফেরার দিন তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে কেরামতের তৈরী ঘর দেখলেন। সে এই সাত দিনে সুন্দর ঘর তুলে ফেলেছে। ঘরের চারপাশে কাঠাল, আম এবং পেয়ারা গাছের চারা লাগিয়েছে।

বশির মোল্লা বললেন, গাছপালা লাগিয়ে তুইতো দেখি হুলুস্থুল করে ফেলেছিস।

কেরামত নিচু গলায় বলল, ফল-ফলান্তির গাছ, পুলাপান বড় হইয়া খাইব।

ভাল করেছিস। ভাল। কয়েকটা নারকেল গাছও লাগিয়ে দে।

জ্বে আচ্ছা।

দেখি এই শ্রাবণেই বিয়ে লাগিয়ে দিব।

জ্বে আচ্ছা।

সেই শ্রাবণে কিছু হল না। তার পরের শ্রাবণেও না। বশির মোল্লা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিডনির অসুখ। চিকিৎসা করাতে সপরিবারে ঢাকা গেলেন।

কেরামতকে বলে গেলেন, সেরে উঠেই বিয়ের ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলবেন। মেয়ে কয়েকটা দেখে রেখেছেন। এদের মধ্যে স্বভাব চরিত্র ভাল দেখে, কাউকে ঠিক করা হবে।

'বিয়ে শাদী হুট করে হয় না। লাখ কথার আগে বিয়ে হওয়া ঠিক না। চির জীবনের ব্যাপার।'

কেরামত নিচু গলায় বলল, কন্যা স্বাস্থ্যবতী হইলে ভাল হয়। ঘরে কাজকর্ম আছে।

অবশ্যই। অবশ্যই। গ্রামের বউ রোগাপটকা হইলে চলে না। আছে, স্বাস্থ্যবতী মেয়েও সন্ধানে আছে। তুই এই বিষয়ে চিন্তা করিস না। আমি আছি কি জন্যে?

কেরামত চিন্তা করে না। নিজের হাতে লাগানো ফলের গাছগুলিকে যত্ন করে। একটা গাছও যেন না মরে। বিয়ের পর ছেলে পুলে হবে, ফল-ফলান্তির গাছ দরকার। বাজারে জিনিসপত্রের যা দাম। ছেলেপুলেকে ফল-ফলান্তি কিনে খাওয়ানো সম্ভব না।

কেরামত বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করে। সে জানে না তার বয়স পাঁচপঞ্চাশ পার হয়েছে। এখন তাঁর মাথায় চুল সবই সাদা। বাঁ চোখে ভাল দেখতেও পায় না। গায়ে সেই আগের জোড়ও নেই। কাজ কর্ম তেমন করতে পারে না। তবু পুরানো অভ্যাসে সারাদিন ক্ষেতে পড়ে থাকে। সন্ধ্যাবেলায় নিজের বাড়িতে এসে অনাগত স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের কথা ভাবতে তার বড় ভাল লাগে।

কৃষ্ণপক্ষ

হানিফ দাঁড়িয়ে আছে জারুল গাছের নীচে।

জায়গাটা বেশ সুবিধাজনক, গাছ গাছড়ায় ঝুপড়ির মত হয়ে আছে — দূর থেকে তাকে দেখার উপায় নেই। টর্চের আলো ফেললেও বোঝা যাবে না। কিছু কিছু বেআক্কেল লোক টর্চের আলো রাস্তায় ফেলার বদলে আশে পাশের ঝোপ ঝাড়েও ফেলে। তবে আশার কথা হল টর্চওয়ালা লোক এই অঞ্চলে নেই বললেই হয়। যে দু'একজন আছে তারা ব্যাটারি বাঁচাবার জন্যে খুট করে খানিকটা আলো ফেলেই টর্চ নিভিয়ে ফেলে।

ভাদ্র মাস।

তালপাকা গরম পড়েছে। হানিফের গায়ে মার্কিন কাপড়ের মোটা পাঞ্জাবী। গা অসম্ভব ঘামছে। অবশ্যি এই রকম অবস্থায় সব সময় তাঁর গা ঘামে। মাঘ মাস হলেও ঘামতো। বড় ধরনের কোন কাজের আগে আগে তাঁর এমন হয়। মানুষ মারা সহজ কোন কাজ না। বড় কাজ।

হানিফ দাঁড়িয়ে আছে নওয়াবগঞ্জের মুনশি রইসুদ্দীন নামের একজন লোককে খুন করার জন্যে। মুনশি রইসুদ্দিনকে সে চেনে না। লোকটা ভাল কি মন্দ তাও জানে না। তবে মন্দ হবারই সম্ভাবনা। ভাল নির্বিরোধী কোন মানুষকে কেউ খুন করতে চায় না।

অবশ্যি লোকটি ভাল হলেও কিছু যায় আসে না। কাজটা করে দিলে হানিফ পাঁচ হাজার টাকা পাবে এটাই আসল কথা। পাঁচ হাজারের মধ্যে এক হাজার তাকে দেয়া হয়েছে। বাকি চার হাজার কাজ শেষ হলে পাওয়া যাবে। আজ কাজ শেষ হলে আজ রাতেই। এইসব ব্যাপারে টাকা পয়সা নিয়ে কেউ ঝামেলা করে না। মাঝে মাঝে বেশীও পাওয়া যায়।

তিন বছর আগে এই রকম একটা কাজের জন্যে দুই হাজার টাকা বেশী পাওয়া গেল। ছ'হাজারের চুক্তি হয়েছিল। পুরো টাকাটা পাওয়ার পর হানিফ বলল, বখশীস দেবেন না? মোবারক শাহ নামের আধবুড়ো মানুষটা অতি দ্রুত মাথা

নাড়তে নাড়তে বলল, অবশ্যই দিব। অবশ্যই দিব। তৎক্ষনাৎ দু'হাজার টাকা দিয়ে ক্ষীণ গলায় বলল, আপনে খুশী তো?

এই একটা মজার ব্যাপার, কাজ শেষ হবার পর তাকে আপনি আপনি করে বলা হয়। এর আগে তুমি। হানিফের ধারণা ভয়ের চোটে আপনি বলে।

হানিফ মোবারক শাহ নামের বুড়ো লোকটাকে বলেছিলো—আমি বসতেছি। কাজ ঠিকমত সমাধা হয়েছে কি-না খোঁজ নিয়ে আসেন, তারপর যাব।

মোবারক শাহ চমকে উঠে বলেছিল—তার দরকার হবে না। আপনের কথা ষোল আনা বিশ্বাস করতেছি। আপনার বসতে হবে না, আপনি যান।

একটু বসি। এক কাপ চা খাই।

মোবারক শাহ ফ্যাকাশে মুখে বলেছে, চায়ের আয়োজন বাড়িতে নাই। আপনে দোকানে গিয়া চা খান। ভংতি টাকা দিতাছি। এই বলে পাঁচ টাকার ময়লা একটা নোট বের করে দিল। হানিফ নোটটা পকেটে রাখতে রাখতে মনে মনে হেসেছে। লোকটার ভয় দেখতে মজা লাগছে, হারামজাদা, মানুষ মারবার সময় খেয়াল ছিল না?

আপনে তা হইলে এখন যান । বেশীক্ষণ থাকা ঠিক না।

হানিফ উদাস গলায় বলল, কোন অসুবিধা নাই।

আপনে হইলেন বিদেশী লোক, আপনেরে সন্দেহ করবো।

আরে না, কী সন্দেহ করবো? এত বড় গঞ্জ, বিদেশী লোক তো থাকবই। এক গ্লাস পানি দিতে বলেন।

পানি দিতেছি। পানি খেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান।

পানি খাওয়ার পরও হানিফ যায় না। জর্দা দিয়ে পান খেতে চায়। পান মুখে দিয়ে বিড়ি ধরায়। উদাস ভঙ্গিতে টানতে থাকে।

আসলে কাজ শেষ হবার পরপরই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে তার ইচ্ছা করে না। বড়ই ক্লান্ত লাগে। ঘুম পায়। তাছাড়া এইসব ঘটনার পর কি সব কথাবার্তা রটে সেইগুলিও শুনতে ইচ্ছা করে। থানা থেকে পুলিশ সাহেব এসে চারদিকে মিথ্যা আতংক জাগিয়ে তোলে। একে ধমকায়, তাকে ধমকায় — এইগুলি দে ়তে ভাল লাগে। পুলিশ সাহেব মুখে দুঃখ এবং রাগ রাগ ভাব ফুটাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। পুলিশ সাহেবের মুখ দেখেই মনে হয় তিনি গভীর আনন্দবে করছেন। খুন খারাবি মানেই তাঁদের পকেটে কিছু কাঁচা পয়সা। কাজেই এইসব ঘটনায় তাঁরা আনন্দিতই হবেন। এটাই স্বাভাবিক। খুব কম করে হলেও দশ বারজনকে ধরে

হাজতে পুরে দিবেন। ওদের ছাড়াতে টাকা লাগবে। খুনীর শত্রুদের টাকা দিতে হবে। যে খুন হয়েছে তার আত্মীয় স্বজনদেরও টাকা খরচ করতে হবে। টাকারই খেলা।

পায়ের কাছে মড়মড় শব্দ হল। হানিফ চমকে খানিকটা সরে গেল। সাপ-খোপ হতে পারে। ভাদ্র মাস হল সাপের মাস। গরমে অতিষ্ট হয়ে তারা গর্ত ছেড়ে বের হয়। হানিফের সঙ্গে একটা টর্চ আছে। আলো ফেলে দেখবে না-কি ব্যাপারটা কি? না, সেটা ঠিক হবে না। আশে পাশে কেউ নেই। টর্চ জ্বালালেও কোন ক্ষতি হবে না, তবু সাবধান থাকা ভাল। পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে। কতক্ষণ ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে তা নিজে ধরতে পারছে না। মাঝে মাঝে মনে হয় সময় কাটছেই না, আবার মাঝে মাঝে মনে হয় অতি দ্রুত কেটে যাচ্ছে।

হানিফ বসল।

হাতের আঙ্গুলে আগুন আড়াল করে সিগারেট ধরাল। পকেটে দশটা সিগারেট নিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, এখন সিগারেট আছে তিনটা। সাতটা এর মধ্যেই খাওয়া হয়ে গেছে। এর থেকে মনে হচ্ছে রাত কম হয়নি। হানিফ রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছল। অন্য সময়ে এতটা ঘামে না। আজ বড় বেশী ঘামছে। মুখের ভেতরটাও নোনতা লাগছে। মানুষের মুখের ভেতরেও কি ঘাম হয়? মনে হয়, হয়। না হলে মুখের ভেতর নোনতা লাগত না।

ঘুট ঘুটে অন্ধকার।

কৃষ্ণপক্ষের রাত, অন্ধকার হবেই। আকাশে মেঘ থাকায় নক্ষত্রের আলোও নেই। খুন করার জন্যে সময়টা ভাল না। এই রকম অন্ধকার রাতে ভুল ভ্রান্তি হয়। ভুল লোক মারা পড়ে। চাঁদনি রাতে হলে ভুল ভ্রান্তি হয় না। কে আসছে দূর থেকে দেখা যায়। সবচে ভাল হয় দিনের বেলা। তবে এই জাতীয় কাজ-কর্ম দিনের আলোয় হয় না বললেই হয়।

কৃষ্ণপক্ষে কাজ করতে হবে বলেই হানিফ গতকাল সন্ধ্যায় দুই ব্যাটারীর এই টর্চ লাইটটা কিনেছে। কাজ করার আগে মুখে আলো ফেলে দেখে নিতে হবে লোক ঠিক আছে কি-না। একবার আলো ফেললেই চিনতে পারবে। আলো না-ফেলে হাঁটা দেখেও চিনতে পারবে - লোকটা হাঁটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ডান পায়ে কোন দোষ টোষ মনে হয় আছে।

লোকটাকে সে যাতে চট করে চিনতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গতকাল তার সঙ্গে আলাপও করেছে। লোকটা প্রতিদিন ভোর আটটার ট্রেনে মোহনগঞ্জ থেকে যায়

বারহাট্টা, ফিরে রাত দশটার ট্রেনে। দলিল লেখক। দলিল লেখকরা সাধারণত হতদরিদ্র হয়,—এ সেই শ্রেণীর না। এর পয়সা কড়ি ভাল আছে। বাড়িতে টিনের বড় বড় দু'টো ঘর। বাংলাঘরের পশ্চিমদিকে টিউবওয়েল। লম্বা বাঁশের আগায় এন্টেনা দেখে বোঝা যায় টেলিভিশন আছে। নিশ্চয়ই ব্যাটারীতে চালায়। এই অঞ্চলে এখনো ইলেকট্রিসিটি আসে নি। ব্যাটারীতে টিভি চালানো খরচান্ত ব্যাপার। তবে লোকটা কঞ্জুষ ধরনের। গতকাল সকালে কিছুক্ষণ সঙ্গে থাকায় তার স্বভাব চরিত্র পরিষ্কার বোঝা গেছে। হানিফ ডিসট্রিক বোর্ডের সড়কে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। মোহনগঞ্জ রেলষ্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যাবে, এতে চেহারাটা মনে গাথা হয়ে যাবে। অন্ধকারেও চিনতে অসুবিধা হবে না।

লোকটা মাটির দিকে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে উঠে এল। হানিফ সঙ্গে সঙ্গে বলল, ভাইজানের সঙ্গে ম্যাচবাক্স আছে? একটা সিগারেট ধরাব। রইসুদ্দিন সরু চোখে তাকাল। নিতান্ত অনিচ্ছায় দেয়াশলাই এর বাক্স বের করল। হানিফ তার সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল। হাসি মুখে বলল, নেন ভাইজান, আপনেও একটা ধরান। লোকটা তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। নিতান্ত অপরিচিত একজন মানুষের কাছ থেকে সিগারেট নিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বা দ্বিধা দেখাল না। কঞ্জুষ প্রকৃতির লোকজনের এই হচ্ছে লক্ষণ। যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে নেয়া।

হানিফ বলল, ইষ্টিশানের দিকে যান না-কি ভাইজান?

হুঁ।

আমি একজন চাউলের পাইকার। চাউল কিনতে আসছিলাম, দরে বনল না। এই দিকে চাইলের দর বেশী।

হুঁ।

লোকটা সব কথার জবাব এক অক্ষরে দিচ্ছে। কঞ্জুষ ধরনের মানুষদের এটাও একধরনের আচরণ। মুখের কথাও তাদের কাছে টাকা পয়সার মতন। সহজে খরচ করতে চায় না। লোকটা বাজারে ঢোকার মুখে এক খিলি পান কিনল। হানিফ সঙ্গে আছে একবার জিজ্ঞেস করল না পান খাবে কি-না।

অথচ কিছুক্ষণ আগেই তার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে বিনা দ্বিধায় খেয়েছে। আশ্চর্য লোক।

হানিফ দুপুরের দিকে রইসুদ্দিনের বাড়িতে গিয়েও উপস্থিত হল। এটা তার দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। কাজ কর্ম করার আগে ঐ বাড়িতে একবার যাবেই। রইসুদ্দিনের বাড়ি ঘর তার পছন্দ হল। হিন্দু বাড়ির মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ি। ফুটফুটে একটা

সবুজ জামা পরা মেয়ে বাংলা ঘরের উঠান ঝাট দিচ্ছে। হানিফ মধুর গলায় বলল, ও মা তুমি এই বাড়ির?

হুঁ।

আমার জন্য গেলাসে কইরা পানি আনতো তিয়াশ লাগছে।

মেয়েটি ভিতরে চলে গেল। কেমন হেলতে দুলতে যাচ্ছে। দেখতে ভাল লাগছে। পাঁচ ছয় বছর বয়স হবে, কিন্তু পরিষ্কার কাজ কর্ম। কি সুন্দর করে উঠান ঝাট দিচ্ছে। মেয়েটি ফিরে এল খালি হাতে। চিকন সুরে বলল, চাপ কল থাইক্যা পানি খাইতে কইছে।

আচ্ছা আচ্ছা। তুমি চাপ কলে চাপ দেও আমি পানি খাই।

মেয়েটি খুব উৎসাহের সঙ্গে কলে চাপ দিয়ে পানি বের করল। মনে হল সে পানি বের করার কাজটায় খুব মজা পায়।

তোমার নাম কি গো?

ময়না।

বড় ভাল নাম— ময়না। রইসুদ্দিন সাব তোমার কে হয়?

বাজান হয়।

আচ্ছা আচ্ছা ভাল।

হানিফের একটু মন খারাপ হল। ঘটনা ঘটে গেলে এই মেয়ে নিশ্চয়ই ডাক ছেড়ে কাঁদবে। কাঁদলেও কিছু করার নেই। ঘটনা সে না ঘটালে অন্য কেউ ঘটাবে। ব্যাপার একই। মাঝখান থেকে এতগুলি টাকা হাতছাড়া হবে। টাকার খুবই দরকার। হাত এখন একেবারে খালি। তার বৌ খানিকটা সৌখিন ধরনের মেয়ে, অভাব সহ্য করতে পারে না। একবেলা উপাস দিলেই চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলে। ছেলে মেয়ে গুলোকে ধরে ধরে পিটায়। সাপের মত ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলে — সর, সর।

টাকাটা পাওয়া গেলে মাস ছয়েকের জন্য নিশ্চিন্ত। শ্যামগঞ্জ বাজারের মেয়ে মানুষটার কাছেও তাহলে ইজ্জত নিয়ে যাওয়া যাবে। মেয়ে মানুষটা বড় তুচ্ছ করছে। গত মাসে একবার গিয়েছিল, দরজা ধরে কঠিন গলায় বলল, আইজ যান গিয়া ঘরে লোক আছে।

হানিফ আবার সিগারেট ধরাল। আর একটা মাত্র বাকি আছে। শেষ সিগারেটটা ধরানো যাবে না। কাজের শেষে একটা সিগারেট ধরাতেই হয়। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সিগারেটের আগুন খুব সাবধানে বৃষ্টির ফোঁটা থেকে আড়াল করে রাখতে হচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটায় আগুন নিভে গেলে সিগারেট আর ধরানো যাবে না। রাতের

ট্রেন আসতে আজ এত দেরী করছে কেন কে জানে। লোকাল ট্রেইনগুলির আসা যাওয়ার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। খুব বেশী দেরী করলে রইসুদ্দিন নামের রোগা কঞ্জুষ লোকটা হয়ত আসবেই না। বারহাট্টায় আত্মীয় বাড়িতে থেকে যাবে। আরো একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। এইসব কাজে অপেক্ষার যন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা। একবার এই রকম একটা কাজে এগারোদিন অপেক্ষা করা লাগলো। লোকটাকে কিছুতেই একা পাওয়া যায় না। সঙ্গে সব সময় একজন না একজন থাকে। অতি সাবধানী লোক। এত সাবধান হয়েও অবশ্যি শেষ রক্ষা হয়নি। কপালে মরণ লেখা থাকলে সাবধান হয়েও লাভ হয় না। লখিন্দর লোহার ঘর বানিয়েও বাঁচতে পারে নি।

এই লোক অবশ্যি সাবধানী না। একা একাই ঘুরা ফিরা করে। তার এত বড় একজন শত্রু আছে তা বোধহয় জানেও না। না জানাই ভাল। জানলে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। মৃত্যু ভয় নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। তাছাড়া মরাটা ভয়াবহ কিছু না। একদিন না একদিন সবাইকেই মরতে হবে। রোগে ভুগে বিছানায় শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে মরার চেয়ে এইভাবে মরে যাওয়া ভাল। কষ্ট অনেক কম। মৃত্যুর পর শহীদের দরজা পাওয়ারও একটা সম্ভাবনা থাকে। অপঘাতে মৃত্যু হলে শহীদের দরজা পাওয়া যায় — মৌলানা সাহেব একবার ওয়াজে বলেছিলেন। অপঘাতে মৃত্যু আর পেটের অসুখে মৃত্যু। এই দুয়ের জন্যে আছে শহীদের দরজা। মওলানা সাহেবদের সব কথা কেন জানি বিশ্বাস হতে চায় না। পেটের অসুখে মৃত্যু হলে শহীদের দরজা পাওয়া যাবে কি জন্যে? কারণটা কি? সত্যি হলে অবশ্যি ভালই হয়। তাহলে বড় মেয়েটা শহীদের দরজা পায়। মেয়েটা মারা গেল পেটের ব্যাথায়। কোন চিকিৎসা করতে পারে নি। কি চিকিৎসা করাবে, হাতে নাই একটা পয়সা। মেয়েটা ছটফট করেছে আর বলেছে – বাজান আমারে ডাক্তারের কাছে লইয়া যাও।

হানিফ নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর মুখে বলেছিলেন –পেট কাটা লাগবে। তিন হাজার টাকা খরচ হবে কমসে কম। আছে টাকা? না থাকলে সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করে দে।

হানিফ তাও পারেনি। মেয়েটা কোলের উপর ছটফট করতে করতে মরল। বড় মেয়েটার মৃত্যুর পর মানুষ মারার প্রথম কাজটা হানিফ করে। যে মানুষটাকে প্রথম মারে তার নাম ছিল দবীর। মরার সময় সেও অবিকল তার মেয়ের মত ছটফট করতে করতে হানিফকে বলল, আফনে আমারে ডাক্তারের কাছে লইয়া যান।

কি আশ্চর্য কথা। যে তার পেটে ছোরা বসিয়েছে তাকেই অনুরোধ করছে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। মৃত্যুর সময় মানুষ অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা করে। কেন করে কে জানে? একবার এক লোকের পেটে ছোরা বসাবার পর দু'হাতে পেট চেপে বসে পড়তে পড়তে খুবই অবাক-হওয়া গলায় জিজ্ঞেস করেছিল — ভাইজান আপনের নাম কি?

মৃত্যুর সময় মানুষের মাথায় বোধহয় কিছু একটা হয়। সব গোলমাল হয়ে যায়। তার বড় মেয়েরও তাই হয়েছিল। মৃত্যুর ঠিক আগে আগে সে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল — বাজান আপনে হাসতাছেন ক্যান? কি হইছে?

হানিফ তখন হাসছিল না। চিৎকার করে কাঁদছিল। সেই কান্না মৃত্যুর সময় মেয়েটার কাছে হাসি হয়ে ধরা পড়ল।

পিপড়া কামড়াচ্ছে।

রাতে পিপড়া কামড়ায় না, কিন্তু এখন কামড়াচ্ছে কেন কে জানে? হানিফ ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে এল। প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল রইসুদ্দিন আসছে। পা টেনে টেনে আসছে।

হানিফ ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। শেষ সিগারেটটা রয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ধরানো যাবে। তবে দিয়াশলাই ভিজে গেছে। ভেজা দেয়শলাই দিয়ে এ সিগারেট ধরানো সমস্যা হতে পারে, এই নিয়েই সে খানিকটা চিন্তিত এবং বিষণ্ন।

অংক শ্লোক

পাখির ডাকে যে সত্যি সত্যি ঘুম ভাঙতে পাড়ে এই ধারণা আমার ছিল না। শহরে পাখি তেমন নেই আর থাকলেও তারা সম্ভবত ভোরবেলায় এত ডাকাডাকি পছন্দ করে না।

ভাটি অঞ্চলে এসে প্রথম পাখির ডাকে জেগে উঠলাম এবং বেশ হকচকিয়ে গেলাম। নানান ধরনের পাখি যখন এক সংগে ডাকাডাকি করতে থাকে তখন খুব যে মধুর অবস্থার সৃষ্টি হয় তা নয়। আমি বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললাম, ব্যাপার কি? কিসের হৈ চৈ?

আমার বন্ধু করিম ঘুম ঘুম গলায় বলল, পাখি ডাকছে। এরা বড় যন্ত্রণা করে। তুই চাদরে মুখ ঢেকে শুয়ে থাক।

করিমের সংগে গত রাতে এই অঞ্চলে এসে পৌছেছি। আমি ঘরকোনা ধরণের মানুষ। বেড়াতে পছন্দ করি যদি বেড়ানোটা খুব আরামের হয়। দু'দিন নৌকায় করে, জীবন হাতে নিয়ে হাওর পাড়ি দেয়ার ব্যাপারে আমার উৎসাহ কম। করিম বলতে গেলে জোর করে আমাকে নিয়ে এসেছে। তার একটাই কথা, তোর লেখালেখিতে সুবিধা হবে। দু'একটা চরিত্রও পেয়ে যেতে পারিস। কিছুই বলা যায় না।

কোথাও বেড়াতে গিয়ে চরিত্র খোঁজা আমার স্বভাব না। ঢাকা ছেড়ে বাইরে গেলেই মানুষের চেয়ে প্রকৃতি আমাকে অনেক বেশী টানে। মানুষতো সব সময় দেখছি প্রকৃতি দেখার সুযোগ কই। যেখানেই যাই প্রচুর বই সংগে নিয়ে যাই। আমি লক্ষ্য করেছি নতুন পরিবেশে আরাম দায়ক আলস্যে বই পড়ার মত মজা আর কিছুতেই নেই। হুট করে কেউ বেড়াতে আসবে না, বিকট শব্দে টেলিফোন বেজে উঠবে না। চেনা জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অন্য রকম আনন্দ আছে। একে বোধ হয় বলে শিকল ছেড়ার আনন্দ।

করিম আমাকে বলেছিল, তোকে দোতলা দালানের বিরাট একটা ঘর ছেড়ে দেব। সামনে বিশাল বারান্দা। বারান্দায় দাড়ালেই দেখবি বিশাল হাওর। ঘাটে পানশি

নৌকা থাকবে, মাঝি থাকবে। যখন ইচ্ছা নৌকায় চড়ে বসবি। আমি তোকে মোটেও বিরক্ত করব না। তুই থাকবি তোর মত।

মোটামুটি লোভনীয় একটা ছবি তুলে ধরল তবে এও বলল, প্রকৃতি দেখতে প্রথম কয়েকদিন তোর ভাল লাগবে তারপর বোর হয়ে যাবি। চারদিকে শুধু পানি আর পানি দৃশ্যের কোন ভেরিয়েশন নেই। অবশ্যি কোনমতে এক সপ্তাহ কাটাতে পারলে দেখবি নেশা ধরে গেছে। তখন আর যেতে মন চাইবে না।

করিমের সব কথাই মিলে গেল। অষ্টম দিনে আমাদের ঢাকা ফেরার কথা। আমি বললাম, আরো কয়েকটা দিন থেকে যাই। করিম বলল, যত দিন ইচ্ছা থাক আমি এই ফাঁকে আমার মামার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। একটা হাওর পরেই আমার মামার বাড়ি। তোকে নিতে চাচ্ছি না। কারণ আমি মামার বাড়ি যাচ্ছি ঝগড়া করার জন্যে। তুই থাক এখানে।

আমি থেকে গেলাম।

দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটতে লাগল পানসি নৌকায়। বিশাল নৌকা। নৌকার ভেতরই গোসলখানা এবং বাথরুম। নৌকার ছাদে শুয়ে থেকে দুলতে দুলতে আকাশ দেখা যায়। একসময় মনে হয় আমি স্থির হয়ে আছি, আকাশ দুলছে। অপার্থিব অনুভূতি, দালান কোঠার শহরে এই অনুভূতি কল্পনা করা সম্ভব নয়।

এক বিকেলে নৌকার ছাদে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যা মেলানোর পর। উঠে বসতেই ভারী গলায় কে যেন বলল, ভাই সাহেব কেমন আছেন? আপনার সংগে দেখা করার জন্যে আসছি। আমার নাম জালালুদ্দিন বি, এ, বি,টি। আমি ভাটিপাড়া মডেল হাই স্কুলের অংকের শিক্ষক। আপনি অসময়ে নিদ্রা মগ্ন ছিলেন। এটা স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হলাম। ঘুম ভাঙতেই উপদেশ শুনতে কারোরই ভাল লাগার কথা না। শিক্ষক সম্প্রদায়ের স্বভাবই হচ্ছে যখন তখন উপদেশ দিয়ে বেড়ানো।

ভদ্রলোক আগের চেয়েও ভারী গলায় বললেন, আপনার বিনা অনুমতিতে একটা কার্য করেছি। নৌকার মাঝিকে চা বানাতে বলেছি। নিজে এক পেয়ালা খেয়েছি এখন আপনার সংগে আরেক পেয়ালা খাব। যান মুখ ধুয়ে আসুন। শহরের বেশীর ভাগ লোক মুখ না ধুয়ে চা খায়। স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর। স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর বিষয়গুলি যিনি এত ভাল জানেন তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভাল দেখলাম না। রোগা কাঠি। মুখ ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি। যক্ষা রুগীর চোখের মত উজ্জল চোখ। বয়স পঞ্চাশের উপরে। পায়জামার উপর কালো রংগের পাঞ্জাবী।

আমি বললাম, আপনি কি কোন বিশেষ কাজে এসেছেন? না এম্নি গল্প গুজব করতে এসেছেন।

কাজে এসেছি। গল্প গুজব করে নষ্ট করার সময় আমার নাই। আপনারও নিশ্চয়ই নাই। লোকমুখে শুনেছি আপনি গল্প উপন্যাস লেখেন। অবশ্য পড়া হয় নাই। সময়ের বড়ই অভাব।

একবার ভাবলাম বলি আমাদের কাজের অভাব আছে। সময়ের অভাব নেই। আমাদের সবার অঢেল সময়। বললাম না কথা বার্তা বলে এই মানুষটিকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হবে না। শিক্ষক শ্রেণীর কেউ কথা বলার প্রশ্রয় পেলে অবনরত কথা বলবে। ফরিদপুরে একবার এমন একজনের সাক্ষাত পেয়েছিলাম। তিনি সন্ধ্যাবেলায় কথা শুরু করলেন এক নাগারে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত বললেন। কেউ কিছু বলতে গেলেই হাত তুলে বলেন এক মিনিট আমি আমার কথাটা শেষ করে নেই। তারপর যা বলার বলবেন।

এই জালালুদ্দিন বি, এ, বিটিও সেই ধরনের কোন মানুষ কি না কে জানে।

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, আপনি কি সিগারেট খান মাষ্টার সাহেব?

তিনি বিরক্তমুখে বললেন, স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর জিনিষ পরিহার করি। চা পরিহার করতে পারি নাই। লেখালেখি করি এই জন্যে চা-টা প্রয়োজন হয়।

আমি অত্যন্ত শঙ্কিত বোধ করলাম।

অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছি গ্রামে গঞ্জে যে সব লেখক আছেন তারা শহরের শ্রোতা পেলে সহজে ছাড়েন না। জীবন অতিষ্ট করে তুলেন।

জালালুদ্দিন বি,এ, বিটি বললেন, আমি কাব্য চর্চা করি।

আমি চুপ করে রইলাম এই সব ক্ষেত্রে উৎসাহ সূচক কোন কথাই বলা উচিত না।

আপনার মনে হয়ত প্রশ্নের উদয় হয়েছে অংকের শিক্ষক হয়ে কাব্য চর্চা কেন করি।

আমার মনে এই জাতীয় কোন প্রশ্নের উদয় হয় নি। অংকের শিক্ষক কাব্যচর্চা করতে পারবেন না এমন কোন কথা নেই।

সঠিক বলেছেন। তবে আমি প্রথাগত কবি নই। আমি গোটা পাটিগনিত কাব্যে রূপান্তরিত করছি।

বলেন কি?

আপনি হয়ত বাপারটা বুঝতে পারছেন না। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেই। পাটিগণিতের একটি অংক আছে এই রকম, ক একটি কাজ পনেরো দিনে সম্পন্ন করিতে পারে। খ সেই কাজ ৩০ দিনে সম্পন্ন করে। ক ও খ মিলিত ভাবে সেই কাজটি কত দিনে সম্পন্ন করিবে? এই অংকটি আমি কাব্যে রূপান্তরিত করেছি। আপনি কি শুনবেন?

অবশ্যই শুনব।

জালালুদ্দিন বিএ, বিটি গম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করলেন :

করিম রহিম ছিল সহোদর ভাই
করিমের যে শক্তি রহিমের তা নাই।
করিম যে কর্ম মাত্র পনেরো দিনে করে
সেই কর্ম রহিম করে এক মাস ধরে।
এখন বালকগণ চিন্তা কর ধীরে,
দুই ভ্রাতা সেই কর্ম কত দিনে করে।।

আমার মুখে কোন কথা জোগাল না। অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভাইসাব কেমন লাগল ?

জ্বি ভাল ।

অন্তর থেকেই বলছেন তো?

অন্তর থেকেই বলছি ।

শুনে প্রীত হলাম। আরেকটা শুনুন চৌবাচ্চার অংক। আবৃত্তি করব?

জ্বি করুন।

চৌবাচ্চা ছিল এক প্রকাণ্ড বিশাল
দুই নলে পানি আসে সকাল , বিকাল।
এক নলে পূর্ণ হতে কুড়ি মিনিট লাগে
অন্য নলে পূর্ণ হয় না অর্ধঘন্টার আগে।।
চৌবাচ্চা পূর্ণের সময় করহ নির্ণন।
দুই নল খুলে দিলে লাগবে কতক্ষন ?

আমি নিজের বিস্ময় গোপন করে বললাম, এ জাতীয় কবিতা মোট কতগুলি লিখেছেন?

তিন হাজার ছয়শত এগারোটা লেখা হয়েছে। এইসব কবিতার আমি নাম দিয়েছি অংক শ্লোক। পরিকল্পনা আছে দশ হাজার পূর্ণ করে পুস্তকাকারে ছাড়ব।

আমি নিতান্ত আনাড়ির মত বললাম, এতে লাভ কি হবে।

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, লাভ কি হবে তাও ব্যাখ্যা করতে হবে? ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে অংক ভীতি প্রবল। কবিতায় সে অংকগুলি পড়লে ভীতি দূর হবে। তা ছাড়া মেধাবী ছাত্ররা অংকগুলি মুখস্ত করে ফেলতে পারবে। পারবে না?

হ্যাঁ পারবে ।

বাঁদরের শ্লোকটা শুনুন। তৈলাক্ত বাঁশ ও বাঁদরের শ্লোক। আমার গ্রন্থে শ্লোক নাম্বার দু'হাজার তিন :

একটি বাঁদর ছিল
দুষ্ট প্রকৃতির
তৈলাক্ত বাঁশ দেখে
হয়ে গেল স্থির।।
বাঁশ বেয়ে উপরে সে উঠিবার চায় ,
পিচ্ছিলতার কারণে পড়ে পড়ে যায়।।
এক মিনিট বেচারা উঠে যতখানি
অর্ধপথ নেমে যায় পরাভব মানি
বংশ দণ্ড কুড়ি ফিট লম্বা যদি হয়
উপরে উঠিবার সময় করহ নির্ণয় ।।

আবৃত্তি শেষ করে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। শান্ত গলায় বললেন, উঠলাম। আপনাকে আর বিরক্ত করব না।

বসুন আরেকটু ।

জ্বি না সময় অল্প –কাজ প্রচুর। দোয়া করবেন যেন কাজটা শেষ করে যেতে পারি। বেশীদিন বাঁচব না। আপনি করিমের বন্ধু। তাকে আমার কথা বলবেন। বললেই সে চিনবে। স্লামালিকুম।

ভদ্রলোক আমাকে দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নৌকা থেকে নেমে গেলেন। নিজে ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকার মত নৌকা নিয়ে এসেছিলেন। অন্ধকারে শুধুমাত্র নক্ষত্রের আলো সম্বল করে নৌকা ভাসিয়ে দিলেন।

আমার নৌকার মাঝি বলল, ইনার নাম পাগলা মাষ্টার। একলা একলা থাকে। রাইত দিন বিড় বিড় কইরা কি যেন বলে। আন্ধাইর রাইতে একলা একলা নাও নিয়া ঘুরে।

ছেলেপুলে নাই?

একটাই মেয়ে ছিল মইরা গেছে।

আমি লোকটির প্রতি এক ধরনের মমতা অনুভব করলাম। ভুল কাজে জীবন উৎসর্গ করে দেয়ার অনেক নজির আছে। ইনিও তেমন একজন। এদের মমতা দেখানো চলে এর বেশী কিছু না।

করিম এল তার পরদিন ।

তাকে জালালুদ্দিন বি এ বিটির কথা জিজ্ঞেস করতেই বলল, তোর কাছে এসেছিলেন না-কি? তাঁকে কি ডাকা হত জানিস? মুসলমান যাদব। অংকের জাহাজ ছিলেন। যে কোন পাটি গণিতের অংক মুখে মুখে করতে পারতেন ।

এখন পারেন না?

পারেন বোধ হয়। তবে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দিনরাত কবিতা টবিতা লেখেন-অংক শ্লোক। মেয়েটা মারা যাবার পর মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। খুব আদরের মেয়েটি ছিল। নাইনে পড়তো। অংকে কাঁচা ছিল বলে বাবার কাছে খুব বকা খেত। মেয়েটা বাবাকে অসম্ভব ভয় করতো। মেয়েটা মরবার আগে বাবাকে বলল, এখন তোমাকে কেন জানি ভয় লাগছে না বাবা । আগে ভয় লাগতো। অংক ভয় লাগতো সেই সঙ্গে তোমাকে ও লাগতো। এখন একটু ও ভয় লাগছে না।

মেয়েটার মৃত্যু স্যারকে খুবই এফেক্ট করে। মাথায় একটা চিন্তা ঢুকে যায় কি করে ছাত্রদের অংক ভীতি দূর করা যায়। আস্তে আস্তে মাথাটাই খারাপ হয়ে যায়। ঢাকায় যাবার আগে তোকে একদিন নিয়ে যাব স্যারের কাছে ।

গেলাম একদিন উনার সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে চিন্তে পারলেন । সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মত কথাবর্তা বললেন। খুব আগ্রহ করে অংক শ্লোকের বিশাল খাতা এনে দেখালেন। গাঢ় স্বরে বললেন, গ্রন্থটির নাম রেখেছি – 'নুরুন নাহার'। আমার কন্যার নামে নাম। বেচারীর বড় অংক ভীতি ছিল । গোপনে কাঁদতো। বইটা আরো পনেরো বছর আগে যদি লিখতে পারতাম .... জালালুদ্দিন সাহেবের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তে লাগল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন। আমার দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বললেন, একটু দোয়া রাখবেন । কাজটা যেন শেষ করতে পারি ।